ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ।। ২ চৈত্র, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১৬ মার্চ, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম তোষণে অকৃপণ কংগ্রেস, সিপিএম-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আসন্ন লোকসভা ভোটকে ঘিরে রাজ্যের বাম-ডান সব দলের মধ্যেই মুসলমান তোষণ মারাত্মক আকার নিয়েছে। রাজ্যের ২৭ শতাংশ মুসলিম ভোটের সিংহভাগ নিজেদের ঝুলিতে টানতে তৃণমূল

কংগ্রেস, সিপিএম এবং কংগ্রেস চেষ্টার কসুর করছে না। ভাবখানা এমন যেন, পাঁচ কোটি ভোটারের চার কোটি হিন্দু ভোটদাতাদের কোনও মূল্যই নেই। হিন্দুরা তাদের পদতলে আছে ধরে নিয়ে তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ দলগুলির নেতারা মুসলিমদের পদতলে যেন ঠাঁই চাইছে। তারা ভুলে যাচ্ছেন, সাধারণ ভোটদাতারা এত বোকা নয়। তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ, বিষ্ণুপুর পশ্চিম

(এরপর ৪ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সিপিএমের 'বি' টিম

কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির কর্মী সমাবেশে আদবানী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কমিউনিস্টরা এখন টিকে আছে কিউবা, কেরল আর কলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এখন সিপিএমের 'বি' টিম। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সি পি এম কংগ্রেসের 'বি' টিম। এভাবেই কলকাতায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রচার অভিযানের সূচনা করে গেলেন বিজেপি তথা এন ডি এ-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী। গত ৭ মার্চ রাজ্য বিজেপি কর্মীদের সম্মেলনে শ্রীআদবানী বাম-কংগ্রেস আঁতাতকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এরাজ্যে ৩৫টি আসনে বামেরা কংগ্রেস বিরোধী ভোটে জয়ী হয়ে দিল্লীতে গিয়ে কংগ্রেসকেই সমর্থন করেছে। এটা জনমতের বিরুদ্ধতা, দ্বিচারিতা। মাত্র সাতটি আসন বেশি পেয়েও কংগ্রেস দিল্লীতে সরকার চালাতে পেরেছে। মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হলেও আসলে পর্দার আড়ালে সোনিয়া গান্ধীই সব। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির এই কর্মী সমাবেশে এদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। কর্মীসভা রূপ নিয়েছিল জনসভায়।

বক্তব্য রাখছেন আদবানীজী। বসে চন্দন মিত্র, তথাগত রায় ও সুকুমার ব্যানার্জী।

শ্রীআদবানী বলেন, ইউ পি এ সরকারের সাফল্যের ঝুলিতে কিছুই নেই। এন ডি এ ক্ষমতায় ফিরলেই মূল নীতি হবে— সুশাসন, উন্নয়ণ এবং সর্বোপরি জাতীয় সুরক্ষা। আদবানীর অভিমত, এবার লোকসভায় বামেদের আসন আগের থেকে অনেক কমে যাবে। তিনি আরও বলেন, এসময় দেশে বিজেপি এবং কংগ্রেস ছাড়া সরকার গঠন সম্ভব নয়।

রাজ্যসভার সদস্য ও 'দি পাইওনিয়র' পত্রিকার সম্পাদক চন্দন মিত্র বলেন, একদা শিক্ষায় শীর্ষে থাকা পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ১৮তম স্থানে। রাজ্য বিজেপির অন্যতম সম্পাদক রাহুল সিন্‌হা বলেন, বিজেপিকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমকে হারানো সম্ভব নয়। সবাই জানে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে নির্যাতিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা সময় পাননি। সেখানে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতারা বারবার গিয়েছেন, এটা বাংলার মানুষ জানে।

মলয় মজুমদার তাঁর ভাষণে বলেন, মমতাদেবী এখন বিজেপির গায়ে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু যখন তিনি এন ডি এ আমলে রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন এই গন্ধ পাননি কেন? বিজেপি যা আগে ছিল তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এছাড়া রাজ্য সহ সভাপতি অমলেশ মিশ্র এবং মহিলা মোর্চা নেত্রী জ্যোৎস্না ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম সহ সভাপতি কর্ণেল (অবঃ) সব্যসাচী বাগচী। মঞ্চে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়, সুকুমার ব্যানার্জী এবং অসীম ঘোষ। এদিন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদার বিজেপিতে যোগ দেন।

এন সি সি এল-এর দাবি

লাহোরে ক্রিকেটারদের ওপর হামলা অজানা ছিল না

সংবাদদাতা।। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের ওপর পাকিস্তানে জঙ্গি হামলা বিশ্বের নজর আবার ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভুয়ো ও অসার প্রতিপন্ন করেছে পাকিস্তান ও আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াই-

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের কনভয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে জঙ্গিরা।

এর কর্মসূচিকেও। মজার বিষয় হল, গুজরাটের আমেদাবাদের একটি এন জি ও— ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর আগাম ঘোষণা ওই হামলার ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। সংস্থাটি অনেক আগেই ঘোষণা করেছিল পাকিস্তানে বিদেশি খেলোয়াড়রা সন্ত্রাসী জেহাদিদের টার্গেট। এমনকী খেলার মাঠে বা আশপাশে হামলার ঘটনা ঘটবে। এরকম দাবি করেছেন এন সি সি এল-এর সভাপতি ভি. কে. সাক্সেনা স্বয়ং। এ ছাড়া তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এরকম ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনেক আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল-এর প্রধান ডেভিড মরগ্যানকে চিঠি দিয়েছিলেন। দাবি জানিয়েছিলেন পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনা থেকে নিষিদ্ধ করার। সেই চিঠিতে শ্রীসাক্সেনা লিখেছিলেন, 'পাকিস্তান জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়ে একটি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আবার সন্ত্রাস-বাদীদের মদতদাতারাও সেখানেই বহাল তবিয়তে রয়েছে। ঠিক এই সময়ে আমার মনে হয়, সারা বিশ্বকেই পাকিস্তানের দিকে নজর দিতে হবে এবং সেখানে ক্রিকেট খেলাই আই সি সি-র নিষিদ্ধ করা উচিত।'' ওই চিঠিতে শ্রীসাক্সেনা আরও জানিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের গভর্নিং বডিতে মুনীর হাফিজ নামে সেনাবাহিনীর এক লেফটেন্যান্টকে নেওয়া হয়েছে। আর সবাই জানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-এর নির্দেশে পরিচালিত হয়। যদি আই সি সি একাজ না করে তাহলে ভবিষ্যতে কিন্তু একরাশ লজ্জা এবং পশ্চাত্তাপ অপেক্ষা করছে।' এভাবেই একেবারে অবতারের মতোই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শ্রীসাক্সেনা। অথচ সাক্সেনার বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে আই সি সি ক্রিকেট খেলার স্বার্থে পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থাকে অবহেলা করেছে। লাহোরে সন্ত্রাসী জেহাদিরা রক্ত নিয়ে হোলিখেলা যে খেলল তা এন সি সি এল-এর কথার বাস্তবতাকেই প্রমাণ করে দিল। এক বিবৃতিতে এন সি সি

(এরপর ৪ পাতায়)

বাঙালি মুসলিমরা আলিমুদ্দিনে পাত্তা পাচ্ছে না

গূঢ়পুরুষ ।। সম্প্রতি টাইমস্ পত্রিকা গোষ্ঠী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আগাম সংকেত দিয়েছে। পত্রিকা গোষ্ঠী তার নিজস্ব সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে লোকসভায় বাম সাংসদদের সংখ্যা ৬০ থেকে কমে ৩৫ হবে। অর্থাৎ এবার নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বামপন্থীরা। কারণ, জাতীয় রাজনীতিতে বামেদের দাদাগিরি ও ব্ল্যাকমেল করার নীতি ভোটদাতারা পছন্দ করে না। নির্বাচনের আগে এইসব সমীক্ষা রিপোর্ট কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে ভোটের আগে বামেদের দিশাহারা অবস্থা দেখে এমন একটা বিপর্যয় যে হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। দেশের কোনও বড় দল বা জোট বামেদের সঙ্গী করতে চাইছে না। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরার বাইরে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাব নেই। সাম্প্রতিককালে বাম প্রভাবিত দুই প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে পার্টির বিরুদ্ধে যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাকে অশনি সংকেত বলা যেতে পারে। তাই আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে বাম শক্তি বিশেষত সি পি এমের ভরাডুবি হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত ৩০ বছর বামপন্থীদের প্রধান ভরসা ছিল গড়ে ২৭ শতাংশ মুসলিম ভোট। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সমর্থন।

(এরপর ১৬ পাতায়)

বীরভূমে মূর্তি চুরি বাড়ছে হুঁস নেই প্রশাসনের

বিশেষ সংবাদদাতা, বীরভূম।। বীরভূম জেলা জুড়ে একের পর এক হিন্দু মন্দির থেকে প্রাচীন দেব-দেবীর বহু মূল্যবান মূর্তি চুরি হয়ে গেলেও জেলা পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও মূর্তি চুরির কিনারা করতে পারেনি। শাসক দলের চাপে ও শাসানিতে মন্দির সংলগ্ন এলাকাবাসীদের প্রতিবাদ করতেও দেওয়া হয়নি বহু জায়গায়। চুরি যাওয়া মূর্তিগুলির পুরাতাত্ত্বিক মূল্য বহু গুণ বেশি। বীরভূম লাগোয়া মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত পেরিয়ে এই সমস্ত বহু মূল্যবান প্রাচীন মূর্তি পাচার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। জেলা পুলিশ প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে না পারায় জেলা জুড়ে প্রাচীন মূর্তি পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যেই গত ৬-৮ মাসে বীরভূমের ৬টি জায়গায় প্রাচীন মন্দির থেকে কষ্টিপাথর, অষ্টধাতু, পিতলের তৈরি বহু প্রাচীন মূর্তি চুরি গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মন্দির এবং দরজা ভেঙে এই সব মূল্যবান মূর্তি চুরি করা হয়েছে। সঙ্গে বিগ্রহের গায়ে পড়ানো গহনা, মন্দিরের বাসনপত্রও চুরি গেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের চুরির ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ ও মন্দির কর্তৃপক্ষ স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে থানার পুলিশ অফিসারদের কাছে উলটে হেনস্থার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ। থানায় অভিযোগ জমা পড়ার পর নামকেওয়াস্তে পুলিশ এসে চুরি যাওয়া মন্দিরে খোঁজ নিয়ে দায় সারে। উলটে গ্রামবাসী ও মন্দির কর্তৃপক্ষকে শাসন করে যায়। যেন এইসব মূর্তি চুরি নিয়ে বিক্ষোভ অশান্তি না করা হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ভয়ও দেখানো হয়। শাসকদলের নির্দেশ মতো জেলা পুলিশের এহেন আচরণে উদ্বিগ্ন জেলার রাজনৈতিক দলগুলি। ইতিমধ্যে জেলার বোলপুর মহকুমার সুঝলে, বোলপুর শহরে, সিউড়ি থানা এলাকার ২টি গ্রামে, রামপুরহাট মহকুমার বেশ কয়েকটি গ্রামে একের পর এক মূর্তি চুরির ঘটনা ঘটেছে। খুব সম্প্রতি, সিউড়ি থানা এলাকার পুরন্দরপুর গ্রামের বহু প্রাচীন মহাপ্রভু মন্দির থেকে বেশ কয়েকটি মূর্তি ও গহনা চুরি গেছে। মন্দির কমিটির দাবি, প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মন্দিরের দরজা ভেঙে চুরি যায়। অথচ সপ্তাহখানেক পরও সিউড়ি থানার পুলিশ প্রকৃত মূর্তির সংখ্যা ও সঠিক মূল্য সম্পর্কে কোনও তথ্যই দিতে পারেনি।

মহাপ্রভু মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে রামকুমার দত্ত বলেন, এই মন্দির আনুমানিক ৫০০ বছরের প্রাচীন। অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণ মূর্তিসহ গোপাল মূর্তি মিলিয়ে প্রায় ১৬টি মূর্তি চরি গেছে।

এ-বিষয়ে সিউড়ি থানার আই সি স্বপন ব্যানার্জি জানান, ঠিক কথা, মূর্তি চুরি হয়েছে। তার আনুমানিক মূল্য কত তা তার এখনও জানা নেই। বীরভূম জেলার পুলিশের এহেন আচরণে উদ্বিগ্ন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। মূর্তি চুরির প্রতিবাদে বিজেপি জেলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে জানা গেছে।

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক নির্বাচিত হলেন। এর আগে দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক ছিলেন। সঙ্ঘের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিম ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পূর্বক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্ঘের প্রায় আড়াই হাজার শাখা এই ক্ষেত্রে চলছে। স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের তিনি সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক স্বস্তিকার প্রকাশক।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে তিনি ইতিপূর্বে কাজ করেছেন। এখন বয়স ৭৩ বৎসর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন। তাঁর পুরো পরিবারই সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে যুক্ত।

এই সময়

জঙ্গি ছক

মুম্বাই-এ জঙ্গি হানার ঘা শুকোতে-না-শুকোতেই আবার বড় ধরনের আঘাতের উদ্যোগে নিচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই। ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, মার্চের শেষের দিকেই লস্কর-ই-তৈবা এবং হিজবুল মুজাহিদিনকে দিয়ে ভারতে আঘাত হানতে পরিকল্পনা নিয়েছে আই এস আই। এ-পর্যন্ত তারা দেড়হাজার জঙ্গিকে ট্রেনিং দিয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের মাটিতেই শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা জঙ্গিদের আক্রমণের টার্গেট হয়েছিল।

হস্তি বিতর্ক

হাতি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল কংগ্রেস ও বহুজন সমাজবাদী পার্টি। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র অখিলেশ প্রতাপ সিং-এর বক্তব্য, রাজ্য জুড়ে বহুজন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী হস্তি পার্ক তৈরি করছেন। এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য কৌশলে বহুজন পার্টির প্রতীক নিয়ে প্রচার চালানো। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর বক্তব্য, পার্কের শোভা বৃদ্ধি করতে এবং হাতির গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখেই পার্কগুলিতে হাতির প্রতিকৃতি দিয়ে সৌন্দর্যায়ণ করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবে বলে অখিলেশ সিং জানান।

গ্রাফোযোগা

হাতের লেখা দেখে মানসিক গড়ন আঁচ করে তার বিকাশ ঘটানো এবং একই সঙ্গে প্রয়োজনমতো যোগাসন অভ্যাসের মাধ্যমে শারীরিক মানসিক ভারসাম্য নিশ্চিতভাবে সন্তোষজনক থাকবে বলে দাবি করলেন বিহারের গ্রাফোযোগবিদ ড: সচ্চিদানন্দ পাণ্ডে। তাঁর দাবি, দীর্ঘ আঠারো বছর দুই হাজার রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছেন তিনি। এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করতে তিনি আগামী দিনে আরও প্রয়াস চালাবেন বলে জানান।

মোবাইল কংগ্রেস

বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে দ্রুতহারে পরিবর্তন হচ্ছে মোবাইল ফোনের। সম্প্রতি নতুন মোবাইল নিয়ে স্পেনের বার্সিলোনায় অনুষ্ঠিত হল মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস। বিশ্বের ১৮৯টি দেশের প্রায় এক লক্ষ মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ই-মেল, ইন্টারনেট ছাড়াও অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা মতো মোবাইল সেট তুলে ধরে বিশ্বখ্যাত মোবাইল সেট কোম্পানীগুলি। এবার উল্লেখযোগ্য ছিল কমন চার্জার-এর ব্যবহার, যা সব সেটেই ব্যবহার করা যাবে। এমনকী বিদ্যুৎ ছাড়াও সৌরশক্তিতে যাতে চার্জ হয় সেজন্য মোবাইল সেট শীঘ্রই বাজারজাত করতে চলেছে বলে জানিয়েছে মোবাইল কোম্পানীগুলি।

প্রতিবন্ধী

বিশ্বজুড়ে বেড়ে চলেছে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সূত্র অনুসারে বর্তমানে পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ লোক কোনও না কোনওভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী। এমনকী আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধী। দুর্ঘটনা বাদে জন্মজাত প্রতিবন্ধীর সংখ্যাটা কীভাবে কমানো যায় সে ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইতিমধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

বিপজ্জনক

দেশের অন্যান্য রাজ্যের রাজধানীর চাইতে সিপিএম শাসিত কেরলের তিরুঅনন্তপুরম মহিলাদের ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। সম্প্রতি তিরুঅনন্তপুরমে ওম্যানস্ রিসোর্স সেন্টার নামে এক এনজিও-র আয়োজিত আলোচনায় উঠে আসে নারী নিরাপত্তার বিপজ্জনক দিকটি। আলোচনায় নববই শতাংশ মহিলাই জানিয়েছেন, তিরুঅনন্তপুরম নারীদের ক্ষেত্রে উদ্বেগের। দৈহিক মানসিক লাঞ্ছনা, কটুক্তি, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি প্রায়ই ভোগ করতে হয় মহিলাদের। সূর্যাস্তের পর তা আরও মারাত্মক আকার নেয় বলে মহিলারা মত ব্যক্ত করেন।

তাজ রক্ষায় তুলসী

হিন্দুদের শিবমন্দিরই তাজমহল--এ নিয়ে বিতর্ক চূড়ান্ত আকার ধারণ করলেও তাজ এখনও টিকে আছে। এবার খোদ উত্তরপ্রদেশ বনদপ্তর এবং লক্ষ্ণৌভিত্তিক অগার্নিক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের বক্তব্য, পরিবেশ দূষণ থেকে তাজকে বাঁচাতে হিন্দুদের পবিত্র গাছ বিস্ময় ভেষজ তুলসীর ব্যবহারই আবশ্যক। দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে তড়িঘড়ি করে ২০ হাজার তুলসীচারা তাজমহলকে ঘিরে লাগানো হয়েছে বলে জানা যায়।

জ্যোতিষী টিকিট

ভোটের দামামা বাজতেই রণকৌশল ও দলের টিকিট বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে সব দলেই। এবারের লোকসভা নির্বাচনে টিকিট বিতরণে নতুন রামায়ণ লিখল তামিলনাড়ুর জয়ললিতা। এ আই এ ডি এম কে সুপ্রিমো জয়ললিতা তাদেরকেই দলের টিকিট দিচ্ছেন, যাদের কুষ্ঠীতে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। দলের টিকিট দেওয়ার সময় কুষ্ঠী মিলিয়ে নিয়ে তবেই তাকে দলের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাচ্ছেন। এতদিন নেতা-নেত্রীদের জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হওয়ার কথা জানা ছিল, কিন্তু ঠিকুজী-কুষ্ঠী দেখে দলের প্রার্থী করার ঘটনা এই প্রথম। সম্ভবত বিশ্বের রাজনীতিতেও এই ঘটনা এই প্রথম।

অশনি সংকেত

মুর্শিদাবাদ জঙ্গিদের কাছে আত্মগোপনের শক্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরগুলির কাছেও তো মুর্শিদাবাদ জেলা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জেলা বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছাকাছি হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পেরেছে এই জেলায় জামাত-উল-মুজাহিদিনের বেশ কিছু সদস্য আত্মগোপন করে রয়েছে। বেশ কিছু মহিলাও তাদের সঙ্গে রয়েছে বলে অনুমান। রাজ্য প্রশাসনকে গোয়েন্দারা এবিষয়ে সজাগও করেছে। মুর্শিদাবাদে জঙ্গিরা খুব সহজেই তাদের কাজ হাসিল করছে বলে গোয়েন্দারা উদ্বিগ্ন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

থার্ড ফ্রন্টের খোয়াব

ভারতে দ্বি-দলীয় জোটই ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। কেন্দ্রে সরকার গঠন করিতে হইলে বিজেপি বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কোনও একটি জোটের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তৃতীয় অন্য কোনও বিকল্প নাই। যদিও ওড়িশায় গত এক দশকের বেশি সময় ধরিয়া চলা বিজেপি-বিজেডি জোট ভাঙিয়া যাওয়াতে তৃতীয় ফ্রন্টের প্রবক্তারা উল্লসিত বোধ করিতেছেন। সম্প্রতি রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু ওড়িশার ঘটনা তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনে গতি সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কর্ণাটকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার নেতৃত্বে একটি তৃতীয় ফ্রন্টও গঠিত হইয়াছে। যেসব দলগুলি লইয়া এই ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছে, তাহাদের আকার-প্রকার এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা একই রকম। আর এই কারণেই যেহেতু দলীয় বা আঞ্চলিক স্বার্থের ঊর্ধে উঠিতে পারে না, রাজনীতিতে তাহারা অস্থিরতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। কেন্দ্রে ইতিমধ্যে দুইবার থার্ড ফ্রন্ট সরকার গঠিত হইয়াছে। একবার ১৯৮৯-এ ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯৬-এ দেবগৌড়ার প্রধানমন্ত্রীত্বে। কিন্তু এই দুইটি সরকারেরই নিজেদের কার্যকালের মেয়াদ পূরণ হইবার পূর্বেই পতন ঘটিয়াছে। এই দুই ফ্রন্ট সরকারই বরাবর কোনও একটি বড় দলের সমর্থনেই দাঁড়াইয়াছিল। অন্যদিকে বিজেপি বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকার যখন কেন্দ্রে সরকার গঠন করিয়াছে, সর্বভারতীয় ও সংগঠিত দল হওয়ার কারণে, যে কোনও কৌশলেই হউক না কেন, নিজেদের কার্যকালের মেয়াদ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমেরিকার সহিত পরমাণুচুক্তি ইস্যুতে বামদলগুলি যখন সমর্থন প্রত্যাহার করিল, মনমোহন সিং-এর সরকার তখন মুলায়ম সিং-এর সমাজবাদী পার্টি ও অন্যান্য কয়েকটি ছোটখাটো দলকে পাশে লইয়া সংসদে আস্থা ভোট অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর যদি থার্ড ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়, এমনকী সাংসদদের সংখ্যার দিক হইতে তৃতীয় স্থানেও থাকে, তাহা হইলে জনাদেশ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। কেননা ইউপিএ বা এনডিএ---কারও পক্ষেই তখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সহজ নয়। এরকম একটি বিপদ সংকেত দুই জোটের পক্ষেই লক্ষ্য করা যাইতেছে। কেননা জোটের শরিকদলগুলি অত্যন্ত সুবিধাবাদী এবং নির্ভরশীল নয়। ওড়িশায় বিজেডি-বিজেপি জোটের ভাঙন ইহার সাক্ষী। অন্যদিকে এনসিপি-র শারদ পাওয়ারকে লইয়া কংগ্রেস স্বস্তিতে নাই। পাওয়ারের চোখ প্রধানমন্ত্রীর আসনটির দিকে। প্রকাশ্যেই তিনি কংগ্রেসের রাজনৈতিক শত্রু। আবার উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির আসন সমঝোতা সত্ত্বেও পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব খুবই প্রকট। অর্থাৎ ইউপিএ বা এনডিএ---কেহই নিজেদের জোটসঙ্গী এবং সমর্থকদের লইয়া স্বস্তিতে নাই।

তবে থার্ড ফ্রন্টের শরিকরাও যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসভাজন এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ফ্রন্ট বহির্ভূত অন্য দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধিতে দ্বিধা করে না। ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করিয়া ২০০৭-এ মুলায়ম সিং- যাদব ইউনাইটেড ন্যাশানাল প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউ এন পি এ) গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই ভারত-মার্কিন চুক্তি ইস্যুতেই কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইউ পি এ সরকারের পতন হইলে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর পদটি লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে বুঝিয়া মায়াবতী ইউ এন পি এ-র সমাবেশে ভাষণ দিয়াছিলেন। কিন্তু খুব বেশি দিন এই ফ্রন্টের সহিত তিনি ওঠাবসা করেন নাই।

থার্ড ফ্রন্টের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হইল, সরকার গড়িলে কে প্রধানমন্ত্রী হইবেন তাহা স্থির করা। কেননা এই প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার অনেকেই। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া আছেনই, সেইসঙ্গে এই দৌড়ে রহিয়াছেন শরদ পাওয়ার মায়াবতীর মতো নেতারাও। এই সমস্যা ইদানীং বিশেষত আরও জটিল হইয়া উঠিবে। এই কারণে যে সিপিএম থার্ড ফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী নির্বাচনে একাধারে 'কিং মেকার' ও যোগসূত্রকারীর ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বর্তমান সিপিএম সম্পাদক প্রকাশ কারাত তাঁহার পূর্বসূরী হরকিষণ সিং সুরজিৎ-এর মতো নমনীয়তা দেখাইতে পারিবেন কিনা এই প্রশ্নটি থাকিয়াই যায়। দ্বিতীয়ত, শরিকদলগুলির মধ্যে দেবগৌড়া বা আই কে গুজরাল-এর তেমন কোনও শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নে সেইসময় মুলায়ম এবং লালুপ্রসাদ কেহই কাহাকেও এক ইঞ্চি জমি ছাড়িতেও প্রস্তুত ছিলেন না।

অন্যদিকে বর্তমানে শারদ পাওয়ার নিজের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অভিলাষ পূর্ণ করিতে বিভিন্ন শরিক দলগুলির মধ্যে বন্ধু খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। যদিও নীতিশকুমার এই বিষয়ে তাঁহার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতেন। কিন্তু নীতিশ কুমার তো থার্ড ফ্রন্টেই নাই। এই প্রশ্নে ফ্রন্টে আরও জটিলতা স্বষ্টির সম্ভাবনা---জয়ললিতা ও মায়াবতীকে লইয়া। ইউ এন পি এ-র গতি দেখিয়া তৃতীয় ফ্রন্টের ব্যাপারে তাহাদের আর কোনও আগ্রহ নেই। বস্তুত বর্তমানে কংগ্রেস বা বিজেপি ব্যতীত কেন্দ্রে কোনও সরকার গঠন সম্ভব নয়। থার্ড ফ্রন্টের কোনও ভবিষ্যৎ নাই।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বিধানসভা উপ-নির্বাচনেও বামবিরোধী হাওয়া

'৬৭ থেকে '৭৭-র বাম হাওয়ার কী নির্মম পরিহাস

এন সি দে

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবাংলায় চলছে বামবিরোধী হাওয়া। কমিউনিস্টদের গরীব-দরদী মুখোশ ক্রমশই খুলে পড়ছে। তাদের কাজের মধ্যে নির্মমতা, বর্বরতা, দ্বিচারিতা, নীতিহীনতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের স্লোগান তুলে ধনী কৃষকদের বাড়তি জমি কেড়ে নিয়ে গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি করে যারা একদিন গ্রামের হিরো হয়েছিল, কৃষকদের ভোট-তরীতে ভেসে তারাই শহরের ক্ষমতায় আজ অধিষ্ঠিত। কিন্তু দীর্ঘ ক্ষমতার বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া কমিউনিস্টরা আজ কৃষকদের চেয়েও প্রমোটারদের অনেক কাছের মানুষ হয়েছেন। শিল্পের নামে কৃষকদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তারা আজ প্রমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক বর্বরতারও আশ্রয় নিচ্ছে। সাংসদ ও বিধায়কদের মুখের ভাষাও হয়ে উঠেছে নির্মম, কঠোর ও অমানুষিক। যেন এক একজন ক্ষুদে হিটলার। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা আজ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু গত এক দশক ধরে বামপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করা যাচ্ছেনা কেন? দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটি একটি নির্মম ঐতিহাসিক সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দ্বিমাত্রিক। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট। জনগণের কাছে কংগেসের বিপরীতে কমিউনিস্টদের আবার কমিউনিস্ট-দের বিপরীতে কংগ্রেসদের বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই দুটি দলের বাইরে কোনও দলই জনগণের মধ্যে তাদের ভিত্তি দৃঢ় করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসী শাসনের সেই কালো দিনগুলির কথা মানুষ আজো ভুলতে তো পারেইনি, উলটে বাম সরকারের আমলে কংগ্রেসের ভূমিকাও জনগণ মেনে নিতে পারেনি। কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় দল হওয়ায় তার সর্বভারতীয় ক্ষমতা লাভের সমীকরণে কমিউনিস্টদের পরোক্ষ সমর্থন কংগ্রেস সব সময়েই ভোগ করেছে। তাই কংগ্রেস সি পি এম তথা বাম দলগুলিকে কখনও হঠাতে চায়নি। বরং বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকুক কংগ্রেস বরাবর তাই চেয়েছে। এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যারা বামপন্থীদের প্রসাদে পরিপুষ্ট ছিল তারা বামফ্রন্ট সরকারকে নানাভাবে তুষ্ট করে গেছে, আর যারা প্রসাদ পায়নি তারা দিনের পর দিন ধৈর্য হারা হয়ে কট্টর বামবিরোধী হয়ে উঠেছে।

এদের মধ্যে একজন হলেন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বুঝেছিলেন পশ্চিমবাংলার রাজনীতির শিরোমণি হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সরকার বিরোধিতা। সরকারের ব্যর্থতা, অপদার্থতা এবং দুর্নীতিগ্রস্ততার বিরুদ্ধে নেতিবাচক রাজনীতি। এই নেতিবাচক রাজনীতি করেই বামপন্থীরা ক্ষমতায় বসেছে। মমতাও আজ বামপন্থী, নেতিবাচক রাজনীতির অস্ত্রকেই কাজে লাগিয়ে অনেকটাই সফল হয়েছেন বা হচ্ছেন। মমতার রাজনীতিতে কোনও দিশা নেই। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনি একজন আদ্যন্ত কংগ্রেসী। তার চরিত্রে নেই রাজনৈতিক বিশ্বাস যোগ্যতা, সংহতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ। তার কাছে আজকের প্রয়োজনটাই বড় কথা। প্রয়োজনে না লাগলে কালকের বন্ধু আজকে তার কাছে অপাংক্তেয়। এই সেদিনও অনির্দিষ্টকালীন অনশনে ফেলে রেখে কংগ্রেস-সিমিএম দুই সরকারই তাকে প্রায় মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিল। বিজেপি তখন সংসদের ভিতরে বাইরে যদি তার হয়ে লড়াই না করত, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন তুলে সেই যাত্রা বেঁচে যাওয়ার সুযোগ তিনি পেতেন না। তার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম লড়াইয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা বারবার ছুটে গেছেন। সেই বিজেপিকে তিনি আজ অচ্ছুৎ করে দিয়েছেন। কেন? কারণ তার ভয় মুসলমানরা তাকে ভোট দেবে না।

এটা ঠিক যে জমি দখল করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যাদের ওপর হামলা করেছে তাদের মধ্যে কিছু মুসলমানও আছে। আর মুসলমানরা যেহেতু সম্প্রদায়গত ভাবে কূপমণ্ডুক। তাদের গোষ্ঠীপ্রীতি যুক্তিহীন গোঁড়ামিপূর্ণ। তাই সব মুসলমানরা আজ বাম-বিরোধী হয়ে গেছে। উলটো দিকে হিন্দু কৃষকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলেও যেহেতু ঐক্যবদ্ধ থাকাকে নিজেরাই সাম্প্রদায়িক বলে ঘৃণা করে, তাই তারা বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা আক্রান্ত হলেও যে সকলে এককাট্টা বামবিরোধী হয়ে গেছে--বামবিরোধী একটি দলকেই বিশেষ করে মমতার দলকেই ভোট দেবে তার নিশ্চয়তা নেই। ঘোষিত হিন্দুর দল হিসেবে বি জে পি-কে অচ্ছুৎ করলেও যে হিন্দুরা মমতার দলের ওপরে সকলে রুষ্ট হবে এমনও নয়। তাই এককাট্টা মুসলমান রোষকে কাজে লাগানোটাই আজ তার কাছে বেশি প্রয়োজন মনে হয়েছে।

তাই বামবিরোধী ভোট ভাগ না করার নামে তিনি সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই হাত মেলাচ্ছেন। যাকে তিনি সিপিএমের 'বি' টিম বলেছিলেন ও এই সেদিনও যার সঙ্গে কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের টগর বোষ্টমীর মতো মিনসের সঙ্গে ঘর করেছি, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেয়নি। যেন কংগ্রেসের ভোট ভাগ হলেই চিন্তা, বিজেপি'র ভোট ভাগ হলে চিন্তা নেই। সিপিএম তথা বামপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিকেশ করতে হলে, বামবিরোধী একটি ভোটও ভাগ করা চলবে না। সমস্ত দলের সঙ্গেই জোট করা দরকার। টগর বোষ্টমীর মতো ন্যাকামি করা চলবে না। মুসলমান তোষণ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা আর হিন্দুর কথা বললে তা সাম্প্রদায়িকতা এই জিনিস বন্ধ করতে হবে। তবে মমতার এটা ভুলে গেলে চলবে না যে কংগ্রেস কিন্তু ভোটের পরে বিজেপিকে রোখার নাম করে সিপিএমের সাহায্যে অথবা তৃণমূল-কংগ্রেসের সাহায্যে কেন্দ্রে সরকার গড়তে চাইবে। তখন মমতা কী করবে? সেটাই দেখার। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে সরকারে যাওয়ার চেয়ে কংগ্রেসে মিশে গেলেই বরং মমতার মঙ্গল। জবাব দিতে হবে না।

এবার বিজেপি'র সম্পর্কে দু-একটি কথা বলেই শেষ করব। আগেই বলেছি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দ্বি-মাত্রিক। সরকার বিরোধিতাই প্রতিষ্ঠান বিরোধী বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ বর্তমান নিয়েই বাঙালি ব্যস্ত। অতীত সে তাড়াতাড়ি ভুলে যায়;৩০ বছর আগের কংগ্রেসীদের জোটবদ্ধ দেখে বাঙালি উল্লসিত হচ্ছে বাম-শাসন থেকে মুক্তির আশায়। মুসলিম তোষণকারী কংগ্রেস এবং তৃণমূল-কংগ্রেসের মতো সে দলের মঞ্চে মুসলিমরা মৌলবাদী টুপি পরে নামাজ পড়ে সেই দল ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের যে সমূহ ক্ষতি হতে পারে, আত্মবিস্মৃত হিন্দু-বাঙালি ১৯৪৬ সালের ১৬-১৮ আগস্টের তৎকালীন বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের মদতপুষ্ট হিন্দুবিরোধী বীভৎস দাঙ্গার কথা ভুলে গেছে।

আজ তারা শুধুমাত্র রাজনীতিতে বিভক্ত, ধর্মীয় অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনীয়তা তার কাছে অপ্রয়োজনীয়।

মুসলিমদের সঙ্গে জোট বেঁধে হিন্দু-বিরোধী কংগ্রেসীদের (তৃণমূল-কংগ্রেসসহ) ক্ষমতায় বসাতে হিন্দুরা উদ্যত। কারণ বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রবহীন নেতৃবৃন্দ বাংলার সরকার বিরোধী আন্দোলনে ধান্দাবাজ কংগ্রেসীদের সরিয়ে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারেনি। নেতিবাচক সরকার বিরোধী আন্দোলন না করলে এই রাজ্যে জায়গা করে নেওয়া যায় না।

বিজেপি যদি সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে সামনের সারিতে এগিয়ে যেতে না পারে, তাহলে জোটের রাজনীতিতে বিজেপি'কে কেউ মূল্য দেবে না--এটুকু নিশ্চিত বলতে পারি। রাজনৈতিক লড়াই বড় কঠোর লড়াই; টিভির পর্দায়, আলোচনা সভায় বসে শুধু হবে না। মমতা মাঠে ময়দানে অনবরত দৌড়চ্ছেন তাই টিভিওয়ালারা তার সঙ্গে দৌড়য়। তাকে টিভি স্টেশনে যেতে হয় না।

"সিপিএম তথা বামপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিকেশ করতে হলে, বামবিরোধী একটি ভোটও ভাগ করা চলবে না। সমস্ত দলের সঙ্গেই জোট করা দরকার। টগর বোষ্টমীর মতো নেকামী করা চলবে না। মুসলমান তোষণ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা আর হিন্দুর কথা বললে তা সাম্প্রদায়িকতা এই জিনিস বন্ধ করতে হবে।"

এরাজ্যে নির্বাচনের শুদ্ধি করণ কি সম্ভব ?

নবকুমার ভট্টাচার্য।। নির্বাচন জীবনের ধর্ম। অসত্যকে, অসুন্দরকে আমরা বর্জন করি, গ্রহণ করি সত্যকে, সুন্দরকে। এই গ্রহণ বর্জন পালনের মধ্য দিয়েই চলে জীবন ও জগতের ক্রমবিকাশ। নির্বাচন যেখানে নিষিদ্ধ, জীবন সেখানে গতিরুদ্ধ। গণতন্ত্র সার্বিক বিকাশের অঙ্গীকার, নির্বাচন এই গণতন্ত্রেরই প্রাণ।

গণতন্ত্রেই মুক্তি। যেখানে গণতন্ত্র নেই, সেখানে একনায়কতন্ত্র। জীবন সেখানে অবরুদ্ধ। বিশ্বের কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানে শাসনক্ষমতা যাঁদের কুক্ষিগত, জনগণকে বাধ্য করা হয় তাদের কাউকে ভোট দিতে। কারণ সেখানে শাসকদলের মনোনীত তালিকার বাইরে কেউ প্রার্থী হতে পারে না। সেখানে শাসক দল ছাড়া দ্বিতীয় দল নিষিদ্ধ।

আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা আজ অসম্ভব বলেই এখানে ভোট দুর্বৃত্তের ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। একথা সত্য এবং সর্বজনবিদিত গণতন্ত্র সাধারণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কে বা কারা পরিচালনা করবে তার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত ও ভোটাধিকারের ওপর। তার সততা, ন্যায়নীতি ও বিচারবোধের ওপর। এই সততা ন্যায়নীতি বিচারবোধ যদি অবাধ না হয়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, কৌশল বা ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে এই ভোটাধিকার ব্যবস্থাকে কলুষিত করা হয় তবে গণতন্ত্র তার তাৎপর্য হারায়। 'আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো' এই ন্যায়সম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সহজ নীতিবোধ এবং সততার ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ভোট পরিচালনায় পুলিশ এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ ও সক্রিয় সহযোগিতা করবেন এটা কাঙ্ক্ষিত। এর অন্যথা হলে বলাবাহুল্য গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকে না, হয়ে ওঠে দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কুৎসিত লড়াই। গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে ক্ষমতা দখলের লড়াই উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

আজ পেশীবহুল এবং দলদাসত্বই ক্ষমতা দখলের আত্মপ্রকাশ হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ ভোটদানের আগ্রহটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। এই অনাগ্রহ সুস্থ সমাজ ও প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনছে।

কেউ কেউ এই ভোটকে উৎসবে পরিণত করেছেন। এটা যে অত্যন্ত গোপন এবং ব্যক্তিনির্ভর একটা ব্যাপার সেটা জনসাধারণকে আজ ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেউ আবার বলছেন, 'এটা ৫২ সালের পরম্পরা'। এভাবে গণতন্ত্রই যদি অর্থহীন হয়ে পড়ে, তবে আর নির্বাচনের প্রয়োজন কী? যথার্থ গণতন্ত্রেই হতে পারে অবাধ নির্বাচন। সেখানে সদর্থক হয় ভোটদানও। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত শাসকদল যা খুশি তাই করতে পারে না। নীতি নির্ধারণ করতে হয় জনস্বার্থ এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি স্মরণে রেখে।

অনেকেই বলে থাকেন, আমাদের মতো দরিদ্র আর অশিক্ষিতের দেশে নির্বাচন অর্থহীন। অশিক্ষিত মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে জানে না। টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায় গরিবের ভোট। কিন্তু কথাটা যে সত্য নয়, জরুরি অবস্থার পরবর্তী সাতাত্তরের নির্বাচনই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি উদাহরণ নন্দীগ্রামের উপনির্বাচন। নন্দীগ্রামের হাজার-হাজার স্কুলে না পড়া অশিক্ষিত নরনারী সচেতন ভাবেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। আত্মচেতনাকে অর্থের কাছে বেচে দেয়নি তারা। গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন। এখন গণতন্ত্র রক্ষার দায় সংবাদপত্রের না সাধারণ মানুষের, নির্বাচনের শুদ্ধি করণে নির্বাচন কমিশন না সাধারণ মানুষের ভূমিকা বেশি—এটা নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণ। গণতন্ত্রকে সজীব রাখে, নবরসে সতেজ করে নির্বাচন। তাই নির্বাচনকে নিরপেক্ষ নিষ্কলুষ রক্ষায় দায় আমাদের সকলের।

আমাদের রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে কিন্তু নেই অবাধ পরিচ্ছন্ন ও স্বাধীন নির্বাচন। স্বাভাবিকভাবে যেখানে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকে যে সরকার, সেখানে পাল্লা দিয়ে বাড়ে সরকার বিরোধী ভোট। সব রাজ্যে সবসময় এটা দেখা গিয়েছে কিন্তু এ রাজ্য ব্যতিক্রম। এখানে মানুষের অসন্তোষ বাড়ে কিন্তু বিরোধী ভোট বাড়ে না বরং তা কমে। তাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে রাজ্যের শাসকদল। টিকে থাকার এই কৌশলটা এসে শিখে যেতে পারলে দিব্যি টিকে যেতে পারতেন অনেকেই। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন, রাজ্যের শাসকদল ভোট ব্যবস্থাকে একটা অশুভ আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছে যা 'বৈজ্ঞানিক রিগিং' নামে খ্যাত। নির্বাচন কমিশন এসব অনুভব করেই ব্যবস্থা নেবেন।

যেসব অশুভ শক্তি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনকে বিঘ্নিত করতে পারে নির্মূল করতে হবে সেই শক্তিগুলিকে। দরকার হলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংস্কার করতে হবে নির্বাচন বিধিও। কেবল ভুয়ো ভোটার ধরলেই প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না। প্রশাসন, পুলিশকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে এবং গ্রামগঞ্জের জনসাধারণকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, নির্বাচন পদ্ধতির ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। ভুলে গেলে হবে না, গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে হলে নির্বাচনের শুদ্ধি করণ অত্যাবশ্যক।

মালদায় বি এস এফ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ছে

তরুণ কুমার পন্ডিত।। মালদা জেলার সীমান্ত বাহিনী (বিএসএফ) প্রহরার কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি বি এস এফের ১২৩ নং ব্যাটালিয়ান সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই, খাতা, খেলাধূলার সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র বিতরণ করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল। মালদা জেলার হবিবপুর থানার সুখনগর ও কৃষ্ণনগর গ্রামের ১১ জন যুবককে ক্ষৌরকার্য চালানোর প্রশিক্ষণ এবং সেইসঙ্গে ক্ষৌরকার্য চালানোর জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডি আই জি দিলবাগ সিং সিধু এই সরঞ্জামগুলি তুলে দেন। ভবিষ্যতে টেলারিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণও দেবেন বলে জানিয়েছেন ডি আই জি। সীমান্তে মহিলা চোরাচালানকারীদের দেহতল্লাসী করার জন্য খুব শীঘ্র জেলায় মহিলা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাটালিয়ান নিয়োগ করা হবে। এদিকে মালদা জেলার মহদীপুর সীমান্তে ৫ জন গরুপাচারকারী আত্মসমর্পণ করেছে।

তোষণে অকৃপণ

(১ পাতার পর)

কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেখানে তৃণমূল প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার সঙ্গেও যেটি মনে রাখার বিষয় তাহল বিজেপি প্রার্থীর চার হাজারের ওপর ভোট পাওয়া। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে একই জিনিস ঘটেছিল। ৪২টি লোকসভা আসনেও হিন্দুবাদী ভোটাররা যে এখনও একজোট তা এতেই প্রমাণিত। জয়ী ভোটের ফলাফলের পর এই ভোটারদের কাছ থেকে ডান-বাম সব পক্ষের নেতারাই কিছু শিক্ষা পাবেন। বিশেষ করে যে সব নেতানেত্রী এখন পুরোমাত্রায় মুসলিম ভজনায় নেমেছেন তারা সাবধান হয়ে যান। অবশ্য এই তালিকা থেকে কাকে বাদ দেওয়া হবে? রাজ্যে টোলগুলি উঠে যাওয়ার উপক্রম হলেও সরকার একের পর এক মাদ্রাসা খুলে চলেছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিএম মহম্মদ সেলিম, হান্নান মোল্লা, সাইফুল হকসহ বেশ কয়েকজন মুসলিম প্রার্থীকে মাঠে নামিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী তো আবার চট্টোপাধ্যায় থেকে ধর্ম বদলে কবীর হওয়া এক সুমনকে যাদবপুরে ভোটে নামাচ্ছে। যাদবপুর কেন্দ্রের দীর্ঘদিন ধরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হিন্দুরা বসবাস করে। তারা কবীর সুমনের জন্য যেন অপেক্ষা করে বসে আছে। এলেই সবক শেখাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইদানীং যেখানেই যান সঙ্গে রিজওয়ানুরের মাকে নিয়ে যান। এনিয়েও হিন্দু ভোট দাতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। হিন্দুরা এসব খেয়াল করছে। লোকসভা ভোটে এমন জবাব দেবে যে তোষামুদে নেতারা সমঝে যাবেন।

ক্রিকেটারদের ওপর হামলা

(১ পাতার পর)

এল বলেছে, তাদের আশংকা মতো মুম্বাই-এ দুঃসাহসিক হামলার অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তান ক্রিকেটারদের ওপর হামলা হয়েছে। ভি. কে. সাক্সেনার কথায়, পাকিস্তান ক্রিকেট-এর ওপর সন্ত্রাস-এর যে দাগ বসে গেল তা সহজে মোছা যাবে না।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এমের প্রাক্তন সাংসদ বললেন
সি পি এমে সৎ লোক নেই

নিশাকর সোম

রাজ্য রাজনীতির অঙ্গনে এখন নির্বাচন ছাড়া কোনও কথা নেই। প্রথম দেখা যাক সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্টের অবস্থান। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর নিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহারে জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা লিপিবদ্ধ করতে চায়। এব্যাপারে সি পি এমের আপত্তি আছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, 'ইতিপূর্বেই আমি এ সম্পর্কে আমার ভুল স্বীকার করেছি। এখন আবার এই কথা লেখার দরকার কি আছে?' ফরওয়ার্ড ব্লক সুপ্রিমো অশোক ঘোষের বক্তব্য, এই দোষ স্বীকার করে জনগণের মার্জনা ভিক্ষা করলে ফ্রন্টের পক্ষেই জনগণ আসবে।

সি পি এমের পার্টি নেতৃত্ব এখনও যেনতেন প্রকারে বাম ঐক্য বাঁচিয়ে তা দৃঢ় করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। যে সি পি এম বামফ্রন্ট জেলা স্তরের নিচে নামাতে চায়নি, তারা এখন লোকাল স্তরেও বামফ্রন্ট কমিটি গড়তে চাইছেন। কিন্তু কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের কর্মীরা অন্য কোনও বামপন্থী দলকে পাত্তা দিতে চান না। রাজ্য সি পি এম নেতৃত্ব খুবই উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। তাঁদের প্রাথমিক মূল্যায়নে বামফ্রন্ট ২৫টির মতো কেন্দ্রে জিততে পারে। যে হাওয়া এখন চলছে, সেটি যদি বজায় থাকে, তবে আমার ধারণা সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের জয়ী আসন সংখ্যা ২০টির মতো হবে। সি পি এম নেতাদের হিসাবে দুই মেদিনীপুর, নদীয়া জেলাতেই সবথেকে খারাপ ফল হবে। সি পি এম নেতৃত্ব মনে করেন, লক্ষ্মণ শেঠ এবং জ্যোতির্ময়ী শিকদারের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। পক্ষান্তরে তাঁরা মনে করে, বিজেপির জুলুবাবুর (কৃষ্ণনগর) জয়ের সম্ভাবনা আছে, যদি কংগ্রেস প্রার্থী না দেয়।

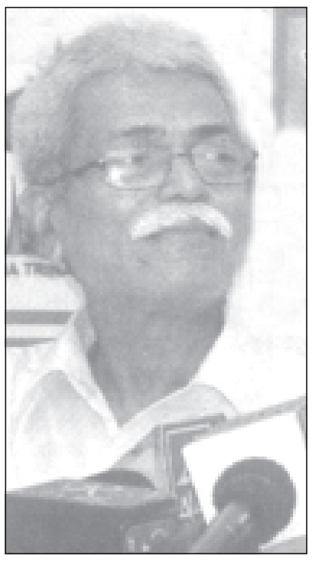

আবু আয়েশ মণ্ডল

সি পি এম রাজ্য নেতৃত্ব হুগলী জেলায় নির্বাচনী কাজে প্রধান দায়িত্ব দিতে চান বিদায়ী সাংসদ অনিল বসুকে।

এদিকে রাজ্য সি পি এম নেতৃত্বের মন্ত্রিসভার সঙ্গে মহারণ শুরু হয়েছে। বুদ্ধবাবু পার্টি সংগঠনের ব্যর্থতা এবং পার্টি সংগঠনের অক্ষমতা বলছেন। সি পি এম, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক দলগুলির মধ্যে অমনোনীত সাংসদ প্রকাশ্যে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করেছেন। মনোনয়ন না পাওয়া ব্যক্তিরা এখন 'বিপ্লবী' সাজছেন। তাঁদের চৈতন্য উদয় মনোনয়ন না পাওয়ার পরই দেখা গেল। আদতে বাম দলগুলির পতন শুরু হয়ে গেছে। সি পি এমের সাংসদ আবু আয়েশ মনোনয়ন না পেয়ে তৃণমূল নেত্রীকে অবলম্বন করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সি পি এম প্রচার এবং সংগঠনে প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছে। অন্যদিকে তৃণমূল-কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী এস ইউ সি-কে বুঝিয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করছে— ফ্রন্ট করেনি। লোকসভার নির্বাচনের পর সি পি এম-কংগ্রেস আঁতাত হবে। বস্তুত এস ইউ সি-ও কংগ্রেসের সমর্থনে দাঁড়াতেই হবে।

তৃণমূল দলে প্রার্থী হওয়ার বিরোধ মেটাতে নেত্রী 'ম্যাটিনি আইডল' শিল্পীদের নাম বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তৃণমূলে বামপন্থী দলে মনোনয়ন না পাওয়ার দল বিপ্লবী বুলি কপচিয়ে মনোনয়নের জন্য নেত্রীর আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। দলছুট বামপন্থী সাংসদরা বলেছেন, পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি অবস্থান করছেন। রাজ্য কংগ্রেসেও টি এম সি-র সঙ্গে বোঝাপড়ার বিরোধী গোষ্ঠী দিল্লীতে সোনিয়াকে বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছেন— 'টি এম সি নেত্রী প্রণব তথা কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কথা বলেছেন তাঁদের সঙ্গে সমঝোতা করা উচিত নয়।' সোনিয়া গান্ধীর কৌশল হল এরাজ্যে টি এম সিকে দিয়ে সি পি এম বিরোধীদের সকল ব্যক্তি গোষ্ঠীকে এক করা হোক। সোনিয়া সি পি এমকে টাইট দিতে চান। সোনিয়ার একটাই লক্ষ্য, তা হল কংগ্রেসের শক্তি বাড়ানো এবং সি পি এমকে কোণঠাসা করা। রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা জেতার জন্য যে কোনও ধরনের মিলিজুলি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়।

তৃণমূল নেত্রী শিল্পী শুভাপ্রসন্নর সল্টলেকের বাসভবনে রাত্রিতে গিয়ে এস ইউ সিকে জয়নগরের সিটটি ছেড়ে দেওয়া নিয়ে পিঠ চাপড়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাঁরা পার্টির বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের ধীরে ধীরে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বহিষ্কার করার দিকে এগোচ্ছে সি পি এম নেতৃত্ব। শুধু সি পি এমের আবু আয়েশ নয়, ফরওয়ার্ড ব্লকের হিতেন বর্মনও বিদ্রোহী বিপ্লবী হয়ে পার্টি ছেড়েছেন। ইনিও তৃণমূলে আশ্রয় নেবেন। আয়েশ বলেছেন, সৎ লোক সি পি এমে থাকতে পারবেন না। দশকের পর দশক ধরে সাংসদ হয়ে যে সুযোগ সুবিধা বৈভব পেয়েছেন তা কি ছাড়া যায়? তাই বিদ্রোহ— বিপ্লবীয়ানা।

সি পি এমের কটুভাষী নেতা তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কোঙার আবু আয়েশ সম্বন্ধে বলেছেন 'পচে গেছে'— হ্যাঁ এই কথাই তো এই কলামে বারংবার লেখা হচ্ছে— সি পি এমে পচন ধরেছে। কাঁঠালের পচনের মতো হলে পচনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। মাছ কিন্তু মাথা থেকেই পচে যায়। আরও মাও-জে-দুং বলেছিলেন, পার্টিকর্মী নেতারা মাছ ও জলের সম্পর্কের মতো জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন।

সি পি এমের কটুভাষী নেতা তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কোঙার আবু আয়েশ সম্বন্ধে বলেছেন 'পচে গেছে'— হ্যাঁ এই কথাই তো এই কলামে বারংবার লেখা হচ্ছে— সি পি এমে পচন ধরেছে। কাঁঠালের পচনের মতো হলে পচনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। মাছ কিন্তু মাথা থেকেই পচে যায়। আর মাও-জে-দুং বলেছিলেন, পার্টিকর্মী নেতারা মাছ ও জলের সম্পর্কের মতো জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। যতীন চক্রবর্তীর ঘটনার বিষয় নিয়ে আলোচনায় আর এস পি-র প্রয়াত নেতা শ্রদ্ধেয় মাখন পাল বলেছিলেন— 'যে সুযোগ সুবিধা সংসদীয় ব্যবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে সেটা কেউই ছাড়তে চাইবে না। মাঝে মাঝে বিপ্লবী ঢেঁকুর তুলবে।'

এ তো গেল বামফ্রন্টের অবস্থা। অপরদিকে তৃণমূল আর কংগ্রেসের মধ্যে কেন্দ্র নিয়ে সমঝোতা এখনও হয়নি। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছেও টি এম সি-র প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে শোনা যাচ্ছে। জোট বিরোধী জনৈক কংগ্রেস নেতা বলেছেন, 'নিজেদের বিকিয়ে কংগ্রেস মমতাকে সুবিধা করে দিচ্ছে।'

টি এম সি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ১০০ শতাংশ সহমত হবে না। এরপর কংগ্রেসের মধ্যে প্রার্থী নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে যা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত চলবে। টি এম সি-র কিছু নেতা ইতিমধ্যেই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, বিশেষ করে সুদীপ ব্যানার্জীকে প্রজেক্ট করার জন্য। সাধন পাণ্ডে কি বলেন? না— সাধন পাণ্ডেকে নেত্রী আর পাত্তা দেন না। কলকাতা সিটে প্রয়াত অজিত পাঁজার নিজস্ব একটা সংগঠন ছিল, সেটা কি অন্য প্রার্থী পাবেন? না।

দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের বাম-টিএমসি-কংগ্রেস সব দলেই মতের দ্বন্দ্ব, পথের দ্বন্দ্ব আর প্রার্থী মনোনয়নের লড়াই চলেছে।

এর ফলে সুবিধা হচ্ছে সি পি এমের। তারা ঘর গুছিয়ে ফেলছে। তবে তাদের পথও কণ্টকাকীর্ণ হবেই। মার্কিন দেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, 'আপনি কিছু লোককে সবসময় ঠকাতে পারেন, সব সময়ে সব লোককে ঠকাতে পারবেন না।' তাই লোক-ঠকানোর কৌশল শেষমেষ পর্যুদস্ত হবেই।

অন্য রকম

গান্ধী চা-ওয়ালা

আমার আপনার কাছে তিনি চা-ওয়ালা। অন্য যে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কাছেও তিনি তাই। আপনি না জেনে তাঁকে চা-ওয়ালা বলে সম্বোধনও করে ফেলতে পারেন। তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একবার চা-ওয়ালা বলার পর পরিবেশটা অবশ্য অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। অস্বস্তিতে পড়তে হতে পারে আপনাকে। তাঁকে এই নামে কেউ ডাকে না। কচি-কাঁচারাও জানে তিনি চা বিক্রি করেন। কিন্তু চা-ওয়ালা নন। এলাকার সবাই তাঁকে চেনেন গান্ধীজী চা-ওয়ালা বলে।

সম্বলদয়াল

এই নামে ডাকার কারণ কী? প্রশ্নটা উঠে আসা স্বাভাবিক। উত্তর যাই ভাবুন না কেন, যা রটে তা কিছু বটে— প্রবাদবাক্যটা এখানে খাটবে। আসলে তিনি পুরোপুরিই গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। ধানবাদের সম্বল দয়াল তামরাকর তাঁর নীতি, আদর্শ, আর কর্মপন্থার দ্বারাই সকলের কাছে গান্ধীজী চা-ওয়ালা হয়ে উঠেছেন। এ নাম তাঁর পিতৃপুরুষের দেওয়া নয়। তিনি নিজেই এই সম্মান পেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। এ যেন পাবলিকের দেওয়া 'অ্যাওয়ার্ড'।

কারও ছেলের লেখাপড়া মাঝ রাস্তায় বন্ধ হবার উপক্রম হলে, তিনিই আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে না হলে সম্বলবাবু টাকা দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সাহায্য করেন। গরীব মানুষকে বস্ত্র দান, ত্রিপল দিয়ে সহযোগিতা করাকে তিনি নিজের জীবনের অঙ্গ বলেই মনে করেন। সম্বলবাবুর অবস্থাও যে খুব ভালো তা নয়। কিন্তু তিনি মনের দিক থেকে ধনী। উদারহস্ত। আর এজন্যই তিনি সকলের কাছে কাছের মানুষ।

সম্বলবাবুর চেহারাটাও অনেকটা গান্ধীজীর মতো। শুধু চেহারা নয়, তিনি নিজেও গান্ধীজীকে দর্শন করেছেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর এই সৌভাগ্য হয়। সেই ছোটোবেলা থেকেই গান্ধীজীর প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধার সূত্রপাত। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি গান্ধীজীর আদর্শকেই জীবনের সব থেকে বড় ধ্যান বলেই মনে করেন। সম্বলবাবুর নিজের জীবনযাত্রাও খুব সহজ-সরল। অনাড়ম্বর। পরিবারও তাঁর এই আদর্শে গর্বিত। তারাও তাঁকে একাজে সহযোগিতা করে।

সম্বলবাবু তাঁর রোজগারের একটা অংশ দীন-দরিদ্র জন্য খরচ করেন। নিজের প্রয়োজনের বাইরে তিনি কখনও বেশি সঞ্চয় করেন না। যা কিছু বেশি উপার্জিত হয় তা তাঁর নয়— সাধারণ মানুষের। আর এজন্যই তিনি গান্ধীজী চা-ওয়ালা। চায়ের ব্যবসা তাঁর পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু চা-ওয়ালা গান্ধীজী আমজনতার দেওয়া নাম।

বাংলাদেশে বি ডি আর-এর অভ্যুত্থান পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

মামুন-অর-রশিদ

বিডিআর বিদ্রোহ আকস্মিক হলেও অপরিকল্পিত নয়। পিলখানার বিডিআর সদর দফতরের দরবার হলে সম্প্রতি পরিকল্পিত বিদ্রোহের প্রমাণ বহন করছে। ঘটনার আকস্মিকতা ও বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণই নেপথ্যে কুশীলবদের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট করে তুলছে। এই ঘটনা দেশের জন্য আত্মঘাতী, যা ধবংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়ানো গণতন্ত্রের জন্য অশনি সঙ্কেত বয়ে এনেছে। বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের গুলিতে আহত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ কামরুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ টিমের সহায়তায় মুক্তি পাওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, "দরবার হলের ভিতরে শাকিল স্যারকে যখন গুলি করা হয়, তখন মুহূর্তের মধ্যে হল ফাঁকা হয়ে যায়। জিরো সেকেন্ডের মধ্যে দরবার হলে ঢুকে পড়ে বিডিআরের সশস্ত্র জওয়ানরা।" দরবার হল থেকে অস্ত্রাগার এক কিলোমিটার দূরত্বে হওয়া সত্ত্বেও মুহূর্তেই বিডিআর জওয়ানদের হাতে অস্ত্র এলো কীভাবে--সেই প্রশ্নই বিডিআর বিদ্রোহে পূর্ব পরিকল্পনার বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিডিআর বিদ্রোহে বিশেষ কারও প্ররোচনায় জল ঘোলা করার কথা বলেছেন। জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিডিআর বিদ্রোহে ষড়যন্ত্র এবং পূর্ব পরিকল্পনার কথা বলেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মূল্যায়নে বলা হয়েছে, বিপুল গণ রায়ে নবাগত শেখ হাসিনা সরকারকে নড়বড়ে করে দিতেই ঘটানো হতে পারে বিডিআর বিদ্রোহ।

জওয়ানরা কেন নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিল, কোন নেপথ্য শক্তির প্ররোচনায় তারা এই নিন্দনীয় ঘৃণ্য কাজটি করেছে—এসব প্রশ্নের জবাব বিডিআর বিদ্রোহের রহস্য আরও ঘনীভূত করছে। সেনা কর্মকর্তাদের কোনওরকম জিম্মি বা আল্টি মেটাম ছাড়া অস্ত্র হাতে তারা কার অঙ্গুলি হেলনে নির্মম হত্যাযজ্ঞে বেরিয়ে পড়েছিল--এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে বিভিন্ন মহল।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংবাদ মাধ্যম স্পষ্ট করেই বলছে, এই ঘটনার পেছনে বিশেষ কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে। অদৃশ্য একটি অপশক্তির সুতার টানে ঘটেছে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পরিক্রমা। এসব গণমাধ্যমের বক্তব্য হচ্ছে, গোটা বিদ্রোহ নবাগত সরকারকে অস্তিত্বের সঙ্কটে ফেলে দিয়েছিল। তারা ঘটনার মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি মুহূর্তের পদক্ষেপ বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করছে বলেও মন্তব্য করেছে। বিডিআর বিদ্রোহ লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং এই ঘটনার বিভিন্ন মহলের আচরণ ও প্রতিক্রিয়া থেকেই সহজে বোঝা যায়, আসলে কারা এই ঘটনায় খানিকটা আলোড়িত হয়েছেন। বিডিআর বিদ্রোহের ৩৬ ঘণ্টার প্রতি মুহূর্তে সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে দেশের সকল সংবাদ মাধ্যমে স্বাধীনতা ভোগ করেছে। এই স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে দেশের অপশক্তি হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ শক্তির মালিকানাধীন একটি টিভি চ্যানেল যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করেছে, তা অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন তৈরি করেছে। তাদের সংবাদ পরিবেশনের ধরণ সারাদেশে বিডিআর বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই হয়েছে কিনা--সে প্রশ্নও উঠছে।

একদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র এক মাস ২০ দিন অতিক্রান্ত। অপরদিকে দায়িত্ব গ্রহণের পরই সরকার '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী জঙ্গি, ঘাতক ও অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ত সারাদেশে, যা গণতন্ত্রের জন্য নিয়ে এসেছিল অশনি সঙ্কেত। দেশের নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট জনদের ভাষায় 'এটি অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্খিত, অনভিপ্রেত, দুঃখজনক। দু'দিনের বিডিআর বিদ্রোহ দেশে গণতন্ত্র বিপর্যয়ের শঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সুনাম-ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করার পর এবার তাদের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ। প্রশিক্ষিত দক্ষ সেনা-কর্মকর্তাদের প্রাণহানির ঘটনায় সেনাবাহিনীতে তৈরি হবে এক ধরনের শূন্যতা। বিডিআর বিদ্রোহের আগুন যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে তাতে দেশপ্রেমিক কোনও শক্তিই লাভের হিসাব কষতে পারছে না। কিন্তু একটি বিশেষ মহল এই ঘটনার সংবাদ পরিবেশনে বিশেষ উৎসুক ভূমিকা পালন করেছে, যা অনেকের সামনেই দৃষ্টিকটু হয়েছে। আবার বুধবারই প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহী বিডিআর জোয়ানদের সাধারণ ক্ষমার পর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কেন বিদ্রোহ প্রলম্বিত হল? কারা এই বিদ্রোহ বৃহস্পতিবার সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে, সারা দেশে একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিল— এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে অনেক নেপথ্য কুশীলব নিজেদের লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে পারবে না।

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে 'মাস্টারমাইন্ড' হিসাবে কাজ করেছে কারা, যারা বিদ্রোহের প্রারম্ভিক ভূমিকায় ছিল তারা কারা এবং কোন জেলার লোক, কোন সালে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, বিডিআর বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী সকলেই কি পুলিশের 'পিএসআই নেত্রকোণা গ্রুপের' মতো বিশেষ কোন জেলার সদস্য? পেশাগত মানসিকতার পরিবর্তে তারা কি দলীয় মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই নিয়োগ পেয়েছে। বিডিআরের বিদ্রোহের সূচনাকারীরা কি বিশেষ কোনও দলের সশস্ত্র ক্যাডার ছিল? পূর্ণ তদন্তের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হলে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিডিআরের সাবেক এক ডিজি যিনি এই পদে থাকার সময় অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন, ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে নানা বিপত্তি তৈরি করেছিলেন; তিনি এই বিদ্রোহ সম্পর্ক বলেছেন, 'এটি কমান্ড ফেইলুরই।' যদি কমান্ড ফেইলুরই হয় তাহলে গণহারে সেনা অফিসারদের হত্যা করা হবে কেন--এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলছে না।

হত্যাযজ্ঞের ধারাটা '৭৫-র নভেম্বর তথাকথিত বিপ্লব ও সংহতি দিবসের মতো হতো কেন, কারা স্লোগান দিয়েছিল 'বিডিআর জনতা ভাই ভাই', কারা মোবাইল এসএমএস পাঠিয়েছে--এসব প্রশ্নের উত্তর সাদামাটা চোখে না দেখে একটু গভীরে পর্যবেক্ষণ করলেই ঘুড়ির সুতার লাটাই পাওয়া যাবে। বিডিআর বিদ্রোহ দেশের সেনাবাহিনীর প্রায় শতাধিক দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতা-কর্মকর্তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই সেনা সদস্যদের পরিবারের ছোট-বড় সদস্যদের অধিকাংশকে হত্যা করা হয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক অফিসারকে একযোগে হত্যা করা কেবল ন্যায্য অধিকার বঞ্চনার বিক্ষোভের ফল হতে পারে না। এই হত্যাকাণ্ড ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। পেশাদার সব ধরনের অফিসারকে হত্যা কি কেবল অধিকার বঞ্চনার বিক্ষোভপ্রসূত হতে পারে, নাকি বিশেষ কোনও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকতে পারে--সে প্রশ্ন বিবেচনায় নিলে বিদ্রোহের কারণসমূহ অধিকতর ও স্পষ্ট হবে। পিলখানায় ছিল ছয় হাজার বিডিআর জোয়ান। আত্মসমর্পণের পর পাওয়া গেল মাত্র পাঁচশো জনকে। অন্যরা কি হাওয়া হয়ে গেল? সম্প্রতি বিডিআর সদর দফতর থেকে লুঙ্গি পরে ভেগে গেছে কারা, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকারী বিশেষ দলটি হামলার পর যেভাবে চট্টগ্রামে বিশেষ নেতার আশ্রয়ে চলে গেছে;এখানেও কি তেমন কিছু ঘটেছে--এসব প্রশ্ন এবং অতীতের বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমায় গৃহীত কৌশলের সাদৃশ-বৈসাদৃশ্য অনেক কিছুরই ইঙ্গিত বহন করছে। বিডিআরের কাছে নাকি বিএসএফ এসএমএস পাঠিয়েছে--এমন গুজব কারা ছড়িয়েছে, এই গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্য কি, ভারতবিরোধী প্ররোচনার জু-জু রাজনীতি কারা করে--এসব প্রশ্নের অনুসন্ধান এই বিদ্রোহের নেপথ্যে নায়কদের আড়াল করার লক্ষ্যে ছড়ানো ধোঁয়া অনেকাংশে দূর করবে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি খবরে ভারতের বার্তা সংস্থাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, বিডিআর বিদ্রোহের পেছনে রয়েছে জামায়াতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

বি ডি আর অভ্যুত্থানের কিছু বিক্ষিপ্ত চিত্র।

সারা জাতি যখন বিডিআর বিদ্রোহে শঙ্কিত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক কৌশলে সঙ্কট নিরসনে যারপরনাই নিবেদিত, তখন দেশের বিরোধী দল সঙ্কট নিরসনের চেয়ে ঘটনা পরিক্রমা জানানোটাই বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে বিডিআর বিদ্রোহ নিরসনের পর বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়ার কথা কেন বললেন? বিদ্রোহে সংঘর্ষ চলাকালীন কেন তিনি নীরব-নির্বিকার ছিলেন--সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়া নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিএনপি দলীয় সাংসদরা জাতীয় সংসদে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সকলেই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। তাঁরা সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্ম-কর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন। ২৯ ডিসেম্বর ভোটযুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা নিজেদের অতীত কুকর্মের কারণে ভরাডুবি হয়েছে--মানতে না পেরে বরং এই পরাজয়ের দায় সেনাবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। ক্ষমতার পাঁচ বছরেও গ্রহণযোগ্য একটি ভোটার তালিকা দিতে না পারার ব্যর্থতা বিবেচনায় না নিয়ে ওয়ান ইলেভেনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। তাদের এই বক্তব্য বিডিআর বিদ্রোহের ধারাল অস্ত্র হয়ে গর্জে উঠেছে কিনা--সে প্রশ্নও থেকে যায়।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম 'দি ইকোনমিস্ট' এবং 'দি টাইমস' পত্রিকায় দেশে নবাগত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত নড়বড়ে করে দেওয়া এবং সরকারের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর দূরত্ব নিশ্চিত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থেকেই ঘটানো হয়েছে এই ঘটনা। এ ছাড়া সিএনএনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এই ঘটনায় '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী চক্র এবং বাংলাদেশ ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমে মৌলবাদী উগ্র জঙ্গিবাদ কায়েমের লক্ষ্যে পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামী গোষ্ঠী এবং এই গোষ্ঠীর মদতদাতা চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে। ---*সৌজন্যে ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ*

অন্ধ্রে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনই প্রধান নির্বাচনী ইস্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পৃথক ‘তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন’-কে আগামী লোকসভা ও অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু করতে চলেছে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি এবং চন্দ্রশেখর রাও-এর দল তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি। এই দাবির মাধ্যমে তেলেঙ্গানা মানুষের প্রতি কংগ্রেসের বঞ্চনাকে তুলে ধরতে উভয় দলই এটা নির্বাচনী ইস্যু করেছে। প্রসঙ্গত, পৃথক ‘তেলেঙ্গানা রাজ্য’-কে ইস্যু করে নতুন রাজনৈতিক দল সিপিআই পৃথক রাজ্যের দাবি সমর্থন করলেও সিপিআই (এম) তা করে না। ক্ষমতায় থাকাকালীন চন্দ্রবাবু এবং তাঁর দল টিডিপি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। ২০০৪-এর সাধারণ নির্বাচনে লোকসভা এবং বিধানসভার ভোটে ক্ষমতাসীন টিডিপি দলের শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। এবার আগে থেকে বিষয়টিকে রাজনৈতিক ভাবে সামনে এনে নির্বাচনী ফায়দা লুটতে চাইছে টিডিপি দল। দলের বক্তব্য তারা মানুষের অন্তরের তাঁর দল নতুন রাজ্য গঠনকে সমর্থন করেছে। নাইডু জানিয়েছেন, তাঁর দল আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে টিডিপি রাজ্যের রাজশেখর রেড্ডি সরকারের দুর্নীতিকে তুলে ধরবে। এছাড়া কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়ণের ব্যর্থতাও অন্যতম ইস্যু। চারদলের জোট এভাবেই শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোমর কষতে শুরু করেছে।

প্রথম দিকে সিপিআই দলও নতুন তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের বিরোধী ছিল।

রাজশেখর রেড্ডি

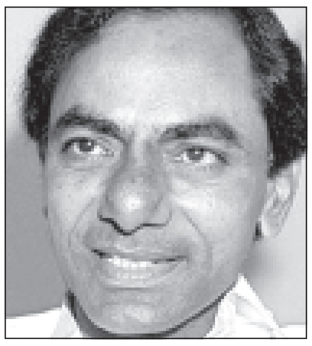

চন্দ্রশেখর রাও

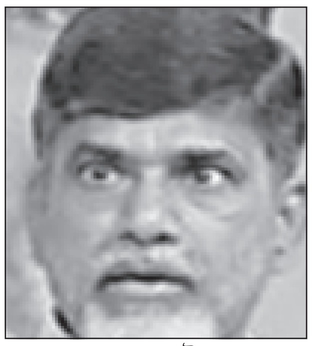

চন্দ্রবাবু নাইডু

তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি বিগত লোকসভার নির্বাচনে ভালো ফল করেছিল।

দলের প্রধান চন্দ্রশেখর রাও নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার তেলেঙ্গানা রাজ্য নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করায় তিনি মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। আবার নতুন করে লোকসভা নির্বাচনের আগেই পৃথক রাজ্যগঠনের দাবি প্রচারে উঠে আসছে। তথাকথিত থার্ড ফ্রন্টে সামিল হয়েছে—টি ডি পি, টি আর এস, সি পি আই, সি পি এম প্রভৃতি দল। এদিকে আবেগকে আঘাত দিতে চান না, তবে সিপিএম নতুন ছোট রাজ্য গড়ার ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে। টিআরএস প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও-এর কথায় সিপিএম শুধুমাত্র তেলেঙ্গানা নয়, যে কোনও রাজ্য ভাঙ্গার বিরোধী। অথচ টিআরএস-এর মতে ‘তেলেঙ্গানা রাজ্য’-এর দাবি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রধান ইস্যু।

একই কথা টিডিপি দলের প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডুরও। তিনি একসময় এই নতুন ‘তেলেঙ্গানা রাজ্য’ গঠনের চরম বিরোধী ছিলেন। এখন তাঁর বক্তব্য হল, মানুষের ভাবাবেগ-এর সম্মান জানাতেই তবে তাদেরকে বোঝানোর পর তারাও সমর্থন করছে বলে জানিয়েছেন চন্দ্রশেখর রাও। চন্দ্রশেখরের মতে ‘তেলেঙ্গানা রাজ্য’-র দাবি কয়েক দশকের পুরনো। এবার বিধানসভার ভোটে এটাই বড় ইস্যু। আগেরবার টিআরএস কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল নতুন রাজ্য গড়ার স্বপ্ন সফল করতেই। কিন্তু কংগ্রেস তেলেঙ্গানা অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এবার মানুষ তাদের উচিৎ শিক্ষা দেবে। উল্লেখ্য, ২১৪ সদস্যের রাজ্য বিধানসভায় তেলেঙ্গানা ক্ষেত্রের আসন সংখ্যা ১১০টি।

নির্বাচনের মুখে সংকটে কেরল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। লোকসভা নির্বাচনের মুখে কেরলে সি পি এম সংকটের মুখে পড়েছে। সরকারি ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ছাড়াও রাজ্য সম্পাদক

পিনারাই বিজয়ন

পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও সি পি এমকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। যে চ্যালেঞ্জটা এখন কেরল সি পি এম-এর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তার শিকড় কিন্তু ‘লালদুর্গ’ বলে পরিচিত কান্নুর জেলাতে।

কান্নুরে যে ব্যাপক উন্নয়ণ হয়েছে তার কৃতিত্ব সি পি এম এখন দাবি করতে পারছে না। কেননা এই উন্নয়ণের যিনি মূল হোতা কান্নুরের সেই সাংসদ এ পি আবদুল্লাকুট্টিকে সি পি এম সম্প্রতি দল থেকে বহিষ্কার করেছে। কুট্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তিনি এই উন্নয়ণের জন্য বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ণ মডেলের প্রশংসা করেছিলেন।

দলের এক সাংসদের এই মোদী প্রশংসা সি পি এম হজম করতে পারেনি। কান্নুরের এক কট্টর সি পি এম নেতার বক্তব্য, সাংসদ এই উন্নয়ণ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত

অচ্যুতানন্দন

করলেও তা করা হয়েছে দলেরই নির্দেশে। দলের এই মোদী বিরোধিতার মুখে সাংসদ কুট্টির পক্ষে একথা প্রমাণ করা সহজ হবে না যে কত ঝড়-ঝাপটা পুইয়ে তিনি এই উন্নয়ণ প্রকল্পগুলি কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই কয়েকবারই কখনও সোজাসুজি, কখনও বা ঘুরিয়ে মোদী মডেলের প্রশংসা করেছেন।

গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো সি পি এমের সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। শ্রীকুট্টি জানিয়েছেন, বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহারের পরেও তিনি আর দলে ফিরে যাবেন না। শ্রীকুট্টির এই ঘোষণা সি পি এম নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ-কে আগামী লোকসভা নির্বাচনে শোচনীয় বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতে শ্রীকুট্টি দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

প্রতিশ্রুতিই সার, ঝুপড়িবাসীদের পুনর্বাসনে ব্যর্থ দিল্লী সরকার

মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পুনর্বাসনের নামে দিল্লীর ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছে দিল্লীর কংগ্রেস সরকার। এরকমই অভিযোগ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা বিজয় গোয়েলের। শ্রীগোয়েল গত ১ মার্চ ঝুপড়িবাসীদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লীর যন্তরমন্তরে এক বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের দুই মন্ত্রী অজয় মাকেন এবং এস জয়পাল রেড্ডির বিরুদ্ধে। শ্রীগোয়েলের অভিযোগ কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার কেউই ঝুপড়িবাসীদের উন্নয়নে কোনও কাজ করছেন না। গত পাঁচ বছরে কোনও সরকারই ঝুপড়িবাসীদের পুনর্বাসনে কোনও ফ্ল্যাট বরাদ্দ করেনি। তারা কেবল একের পর এক অন্তঃসারশূন্য ঘোষণা করে গেছে।

বিজেপি নেতা শ্রীগোয়েলের অভিযোগ, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই দিল্লীর কাঠপুতুল কলোনীতে পুনর্বাসনের জন্য বাড়ি তৈরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

ঝুপড়িবাসীদের অভিযোগ, সরকার ফ্ল্যাটের কোনও দামই এখনও নির্ধারণ করেনি। এর আগে একই পদ্ধতিতে বাঙালি ক্যাম্প, খান মার্কেট, কবরস্থান এবং কিদোয়াই নগরের বস্তিবাসীদের হাউসিং স্কীমের নামে প্রতারণা করা হয়েছে। তাদের দাবি, সর্বাগ্রে ফ্ল্যাটের মালিকানা দিতে হবে রেজিস্ট্রি করে।

গত বছরই ‘রাজীব রত্ন আবাস যোজনা’-

এর অন্তর্গত কর্মসূচীতে ফ্ল্যাট দেওয়ার জন্য ছ’লক্ষ ফর্ম বিক্রি করে সরকার কমপক্ষে ৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। অথচ একটিও ফ্ল্যাট দেওয়া হয়নি একজনও আবেদনকারীকে। একজন বিক্ষোভকারী জোর গলায় বলেছেন, এই দুরবস্থার জন্য অজয় মাকেনই দায়ী। তিনি গরীবদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কিছুই করেননি। অথচ তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটা ভালো দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন।

কসাইখানার বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণের নিয়ম হোক ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কসাইখানা থেকে যেসব অস্বাস্থ্যকর বর্জ্য পদার্থ বের হচ্ছে, তা ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কিছু নিয়ম-কানুন তৈরির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একটি জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল, এইসব কঠিন বর্জ্য পদার্থ নর্দমা দিয়ে ও মাটির তলায় পুঁতে দেওয়ার ফলে বার্ড ফ্লু, পা ও মুখের অসুখ দেখা দিচ্ছে। প্রধান বিচারপতি কে জি বালকৃষ্ণণ, বিচারপতি পি সত্যশিবম ও জে এন পাঞ্চালকে নিয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ গত ৩ মার্চ রাজ্য দূষণ পর্ষদকে এই মর্মে কিছু নিয়মনীতি তৈরির নির্দেশ দেয়।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রধান অ্যাডভোকেট রণজিৎ কুমার বলেছেন, দেশের বেশিরভাগ কসাইখানাই পঞ্জীকৃত নয় (আনরেজিস্টারড্) এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকেও কোনও অনুমতি নেয়নি। কসাইখানাগুলোর বর্জ্য পদার্থ সাধারণত নর্দমা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়, নয় তো মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। এর ফলে জলস্তর অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে এবং পরিণামে বার্ড ফ্লু ও চর্মরোগের প্রার্দুভাব দেখা যাচ্ছে।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

।। ১২ ।।

দু'হাজার ছ'সালের প্রথমেই জানা গেল এক চাঞ্চল্যকর খবর — আই এস আই-এর এক অতি বৃহৎ সংযোগের কথা এবং সংযুক্তির— সে-ব্যক্তি উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী!

এই ভয়াবহ আতঙ্কজনক সংবাদটি দিয়েছেন একজন অতি দায়িত্বশীল আই পি এস অফিসার, মলয়কৃষ্ণ ধর, তিন দশক ধরে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি ছিলেন আই বি-র জয়েন্ট ডিরেক্টর। খবরটি তিনি দিয়েছেন তার Fulcrum of Evil : ISI-CIA-AI Quida Nexus নামে বইটিতে।

চাকুরি জীবনে উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নানা কর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেননি। শুধু বলেছেন সেই মুখ্যমন্ত্রী 'মধ্য উত্তর ভারত' থেকে। তিনি কংগ্রেস পার্টির নন। বিস্ময়কর যে সেই মুখ্যমন্ত্রী এখনও (২০০৫) আপন পদে আসীন। এই সময়ে সাংবাদিকেরা ধরকে মুখ্যমন্ত্রীটির নাম প্রকাশ করার জন্যে জোর দিলে তিনি বলেন — "I won't be able to prove it in the court if the person concerned files a suit. Do you think the IB would reveal the operational as well as other details to the court?" ধর বলেছেন — 'Intelligence Fraternity', জেনে শুনেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিতরে আই এস আই-এর প্রভাব ও বিস্তার সম্বন্ধে সব কথা বলতে ভয় পান। তারা ইচ্ছে থাকলেও সত্য কথা প্রকাশ করতে পারেন না। এ-অবস্থা চলেছে অব্যাহতভাবে অনেক দিন ধরে। কারণ ইন্টেলিজেন্সের কর্তাদের সব সময়ে ভয়ে ভয়ে কাজ করতে হয়, এর পরে দিল্লীর মসনদ কাদের দখলে যাবে, তাদের আবার কোন দৃষ্টিভঙ্গি হবে তাদের কাজকর্মের প্রতি, সে কথা সর্বদা ভাবতে হয়। ভবিষ্যৎ তো তাদের উপরেই নির্ভরশীল।

ধর জানান — ওই মুখ্যমন্ত্রীর উপরে এক সময়ে নজর রাখা হয়েছিল আই এস আই-এর সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্যে। তিনি বলেন, বাইরের এই অন্তর্ঘাতমূলক দেশবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে সংযোগ অত্যন্ত গভীর, তা শুধু জাতীয় দিবস পালন উৎসব বা ইফ্‌তার পার্টির বার্তালাপেই সীমাবদ্ধ নয়। ভ্রষ্ট চরিত্রের রাজনৈতিকদের কাছে কুয়াৎে, ইরান, পাকিস্তানের অ্যামব্যাসি থেকে কীভাবে অর্থের স্রোত বয়ে যায় — তাও অনুসন্ধিৎসার বিষয়। আই এস আই — এজেন্টরা ঢুকে গেছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও, যারা রাজনীতি করেন তাদের অনেকের সঙ্গে ই আই এস আই-এর সংযোগ। অসমের কথা উল্লেখ করে ধর বলেন — এই রাজ্যের অন্তত দশজন বিধায়ক এবং দু'জন মন্ত্রীর (২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে যে নির্বাচন হয়ে গেল তার আগের জানুয়ারি মাসে এই সব কথা হয়েছে) সঙ্গে আই এস আই এজেন্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বিহারের রাজনীতিক মহলের অনেকটা একই অবস্থা। কাঠমান্ডু স্থিত আই এস আই এজেন্টদের কোনও কোনও ভূতপূর্ব বিধায়ক, ভূতপূর্ব মন্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। আই এস আই-এজেন্টরা নেপাল-বিহার-উত্তর প্রদেশের অপরাধীদের সঙ্গে সমবেতভাবে কাজ করে। দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যে কী ভয়াবহ, ভ্রষ্ট রাজনীতিকরা যে কীভাবে দেশকে বিকিয়ে দিচ্ছে, ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি যে দেশকে ভয়ানক খাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, দেশের কোথাও যে কোনও নিরাপত্তা নেই — মলয়কৃষ্ণ ধরের বইটি পড়লেই তা বোঝা যায়।

সেবারের (২০০৬) প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লীতে বড় রকম বিস্ফোরণ ঘটাবার যে প্ল্যান ছিল আগের দিন হরকৎ-উল-জেহাদ-এ-ইসলামির দুই সন্ত্রাসবাদীর গ্রেপ্তারের ফলে তা জানা যায়। দুই বাংলাদেশি মহম্মদ সইদ-উল ও সোহেদ উলকে দিল্লী পুলিশ গ্রেপ্তার করে পূর্ব দিল্লীর শাস্ত্রী পার্ক এলাকা থেকে। তাদের কাছে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ, যার মধ্যে ছিল ১৪২০ কেজি তুড়ৎবত্ব বিস্ফোরক, চারটি ইলেক্‌ট্রনিক ডিটোনেটর, দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড প্রভৃতি। হরকৎ-উল-হিজম্‌ এরই একটি শাখা, এদের হেডকোয়ার্টার বাংলাদেশে।

এর আগে হায়দরাবাদ পুলিশ মহম্মদ ইব্রাহিম নামে এক আতঙ্কবাদীকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে উপরোক্ত দুই বাংলাদেশির কথা জানা যায়। এই বাংলাদেশি উগ্রপন্থীরা দিল্লীতে তাদের আস্তানা বানিয়ে দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা অন্য উগ্রবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় দিচ্ছে। তাদের জন্যে নিয়ে আসছে বিস্ফোরক, হাওলা অর্থ। সইদ-উল স্ক্র্যাপ ডিলারের কাজ করছিল উসমানপুরের ঘাড্ডে ওয়ালি মসজিদে। তার কাছে সম্প্রতি এসেছে সোহেব উল। তাদের প্ল্যান ছিল ২৬ জানুয়ারি খুব বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাবার। যেজন্য বিস্ফোরকগুলি আমদানি করা হয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে। এরা নিয়মিতভবে আই এস আই-এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

বাংলাদেশ থেকে আসা সন্ত্রাসবাদীরা যে কী ব্যাপকভাবে এদেশে ছেয়ে আছে তাদের বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল ৮ মার্চ তারিখে যখন লস্কর-এ-তৈবা সন্ত্রাসবাদীকে পশ্চিম দিল্লীর বাওয়ানা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষে হত্যা করে হোলাম্বি অঞ্চলে। এদের একজন বাংলাদেশে লস্কর-এর প্রধান গুলাম ইয়াজদানি এবং তার সহযোগী আহসান উল্লাহ্‌ হাসান, যে ছিল উঁচু ধরনের হরকৎ-উল-জেহাদ-এ-ইসলামির সন্ত্রাসবাদী। ইয়াজদানি ভারতে এর আগে অনেক সন্ত্রাসবাদী হামলায় যুক্ত থাকায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে' নাম ছিল। পুলিশ অনেকদিন ধরে এদের পেছনে লেগে ছিল। এদের কাছে যে অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায় তার মধ্যে ছিল দুটি ম্যাগজিন সহ এ কে ৫৬ অ্যাসল্ট রাইফেল, ৫১ রাউণ্ড গুলি, চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, চার কেজি তুড়ৎবত্ব বিস্ফোরক, চেকোশ্লাভিয়ার তৈরি দুটি ৭ এম এম পিস্তল, ৪৭ হাজার টাকার নকল নোট এবং কিছু তথ্যপত্র।

ইয়াজদানি ছিল হায়দরাবাদের হাসান বাংলাদেশি। ইয়াজদানি হায়দরাবাদে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিল। হায়দ্রাবাদে বহু বিস্ফোরণের ঘটনায় সে জড়িত। ২০০২ সালে দিলসুখ নগরে সাঁইবাবা মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণে সে জড়িত ছিল, কিন্তু তারপর থেকে সে পলাতক। পরের বছর পাকিস্তানে সে লস্কর সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণে উগ্রপন্থী ট্রেনিং পায়। পরের তিন বছর সে বাংলাদেশে কাটায়। ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে হায়দ্রাবাদের টাস্ক ফোর্স অফিসে একটি বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত অন্যতম ব্যক্তি কালিম ওরফে আরশাদ স্বীকার করে যে তাকে গুলি চালনায় ও বিস্ফোরণে ঘটাবার ব্যাপারে ইয়াজদানি ট্রেনিং দিয়েছিল। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে শ্রমজীবী এক্সপ্রেসে ও হায়দ্রাবাদে সিটি টাস্ক ফোর্স অফিসে বিস্ফোরণের এবং ২০০৩-এ একজন বিজেপি নেতাকে হত্যা-প্রচেষ্টার পশ্চাতে সে জড়িত ছিল। ওই একই দিনে (৮ মার্চ), লক্ষ্ণৌর গোঁসাইগঞ্জ অঞ্চলে, আর এক 'মোস্ট ওয়ান্টেড' লস্কর-এ-তৈবা সন্ত্রাসবাদী মহম্মদ সালিম সালার ওরফে ডক্টর (৪৫) উত্তর প্রদেশ এবং জম্মু কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারায়। আগের দিন বারাণসীতে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সে জড়িত ছিল বলে পুলিশের অভিযোগ।

আবু শারারা নামেও পরিচিত এই ব্যক্তিকে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ খুঁজছিল। ১৯৯৫ সালে কাশ্মীর ভ্যালি থেকে যে নয়জন বিদেশি ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছিল তার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ছিল এক ব্যক্তি। ন'জন বিদেশির অন্যতম এক নরওয়ের অধিবাসীকে পরে অপহরণকারীরা হত্যা করেছিল।

সংঘর্ষের পর পুলিশ সালিমের কাছে পেয়েছিল চারটি ডিটোনেটর, ২.৫ কেজি আর ডি এক্স, একটি চীনা পিস্তল। সালিম জীবন শুরু করেছিল রতলাম শহরে (মধ্যপ্রদেশ) একজন সাধারণ কোয়াক (হাতুড়ে) হিসেবে। সেখান থেকে পৌঁছে গিয়েছিল 'মোস্ট ওয়ান্টেড' লিস্টের শীর্ষে। দিল্লীতে লস্করের সব কর্মবিধি ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। লস্করের সুপ্রিম কম্যান্ডার সইফুল্লার কাছ থেকে সে সরাসরি নির্দেশ নিত। নেপালস্থিত লস্করের আবদুল আজিজ তাকে নিয়মিত ভাবে দিত অঢেল অর্থ। সালিম বিহারেও তার জাল বিছিয়েছিল।

।। ১৩।।

ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে দু-দু'বার শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়ে (কারগিলেও জেনারেল মুশার্‌রফের 'মিস অ্যাডভেঞ্চার' পাকিস্তানের ললাটে কলঙ্ক লেপনই করেছে), পাকিস্তান হাড়ে হাড়ে বুঝেছে সোজাসুজি লড়াই-এ ভারতের সঙ্গে সে সুবিধা করতে পারবে না। তাই সে অবলম্বন করেছে অন্য পন্থা।

এক সময়ে পাঞ্জাবে সে আগুন জ্বালিয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে উগ্রবাদকে উসকে দিয়ে দিয়েছে সবরকম সাহায্য, কাশ্মীর সহ ভারতের সব রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে আই এস আই এজেন্ট, সিমি সহ অন্যান্য মৌলবাদী গোষ্ঠীর সাহায্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়েছে হিংসা-বিদ্বেষ-বিভেদের বীজ। ভারত-নেপাল ও বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ভারতের আই এস আই-এজেন্টদের সন্ত্রাসবাদী ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি করছে এবং সেই সঙ্গে ছড়িয়েছে কোটি কোটি টাকার জাল ভারতীয় নোট। মুখে সমঝোতার কথা বললেও এবং কখনও কখনও আমেরিকার চাপে সুর নরম করলেও, পাকিস্তানের একটিই উদ্দেশ্য — ভারতের সর্বনাশ সাধন।

এই নিবন্ধে বিশেষ করে আই এস আই-এর কথা বলা হয়েছে, যেমন পরবর্তী নিবন্ধে সিমি-র কুকীর্তির কর্মকান্ডের বিবরণ, কখনও কখনও প্রসঙ্গত বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে ভারতবিরোধী আতঙ্কবাদী ট্রেনিং এবং সীমান্ত থেকে ভারতে বিনাশমূলক টেররিস্ট ও উপাদান সরবরাহের কথা ধারাবাহিক ভাবে প্রথম থেকে বিস্তারিত বলা হয়েছে বর্তমান লেখকের 'The Naga Rebels and Insurgency in the North East' (Vikas, 1998), 'The Nexus Web : Insurgency in the North-East' (Kanishka, 2001) ÛõÑ 'Blazing North-East Insurgency in the New Millenium' গ্রন্থ তিনটিতে। এই তিনটিতে সেই ভয়াবহ বিবরণ পাঠককে শিহরিত করবে।

ভারতে সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডে এবং আই এস আই-এর ভূমিকার কথা পাকিস্তান সর্বদা অস্বীকার করেছে। তাদের সেই মিথ্যা মুখোশ সম্প্রতি খুলে দিয়েছে পাকিস্তানেরই অতি আদরের আফগানিস্তানের তালিবানদের একটি দল ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার কে সূর্যনারায়ণের হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে।

আফগানিস্তানের নবনির্মাণ-কর্মে ভারত সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন। ইঞ্জিনিয়ার কে সূর্যনারায়ণ ছিলেন আফগানিস্তানের নবনির্মাণে ভারতের এক তরুণ কর্মী। তাকে কর্মরত অবস্থায় ২৮ এপ্রিল অপহরণ করে নেয় তালিবান মিলিশিয়া। তাকে উদ্ধারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৪ মে কাবুল-স্থিত একটি প্রাইভেট টি ভি চ্যানেলে— টোলু টি ভি-তে তালিবান কম্যান্ডার এক সাক্ষাৎকারে জানায় পাকিস্তানের আই এস আই-এর আদেশে, মৌলবি মোহাম্মদ আলম আন্দার-এর নির্দেশে, মুল্লাহ্‌ লতিফ, একজন মিলিশিয়া সূর্যনারায়ণকে ৩০ এপ্রিল হত্যা করে। আমির খান হাক্কানি, জাবুল প্রভিন্সের মিলিশিয়া কম্যান্ডার এই হত্যার বিরোধ করেছিলেন।

আই এস আই কীভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার জাল বিছিয়েছে এবং বিছিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় কলম্বো (শ্রীলঙ্কা) থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র 'সুদারওলি'র একটি সংবাদে ঃ স্ববড্র এবং শ্রীলঙ্কার সরকারের মধ্যে শান্তি-সমঝোতায় প্রয়াস করছেন নরওয়ে সরকার। উপরোক্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত খবর অনুযায়ী পূর্ব-শ্রীলঙ্কার একটি মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংস্থা 'জিহাদ' কে সর্বপ্রকার সাহায্য দিচ্ছে পাক-আই এস আই এবং এইভাবে দেশের মধ্যে অরাজকতার মাধ্যমে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। এজন্যে স্ববড্র-র প্রবক্তা এবং প্রধান শান্তি নেগোশিয়েটর অ্যান্টন বালাসিঙ্গম্‌ (২৯ মার্চ, ০৬ তারিখে) নরওয়ে পিস ফ্যাসিলিটেটর এরিক সোলহেইম-এর কাছে অভিযোগ করেছেন (যখন তিনি লন্ডনে ২৯.৩.০৬ তারিখে সোলহেইমকে সাক্ষাৎ করেছিলেন)।

'সুদার ওলি' সংবাদপত্রের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে, বালাসিংঘম্‌ বলেছেন — "জিহাদ গ্রুপ সম্বন্ধে এবং তাদের সঙ্গে পাক ইন্টেলিজেন্সের সম্বন্ধের সমস্ত ডিটেল আমি তাকে (সোলহেইমকে) দিয়েছে।" বালাসিংঘম্‌ তাকে আরও বলেছেন যে — শ্রীলঙ্কার আর্মির ইন্টেলিজেন্স উইং-এর সহায়তার জিহাদ গ্রুপ কাজ করছে। জিহাদ গ্রুপের কথা তারা প্রকাশ করেছেন তখনই শ্রীলঙ্কা সরকার এই ব্যাগ-ট্যাগ (নিম্ন শ্রেণীর) গ্রুপকে তাদের নিয়মিত সেনাদলের মধ্যে নিয়ে তাদের চাপা দিয়ে দিয়েছে, মুসলিম রেজিমেন্ট সৃষ্টি করে শ্রীলঙ্কা সরকার জিহাদ গ্রুপকে তাদের নিয়মিত সেনাদলের মধ্যে নিয়ে তাদের চাপা দিয়ে দিয়েছে। মুসলিম রেজিমেন্ট সৃষ্টি করে শ্রীলঙ্কা সরকার জিহাদ গ্রুপকে বৈধতা দিতে চায়।

প্রো-স্ববড্র ওয়েবসাইট তামিল নেট অনুসারে জিহাদের উপরে স্ববড্র ডোসিয়ারে কিছু জিহাদী ব্যক্তির, তাদের নেতা ত্রিঙ্কোমালি স্থিত শ্রীলঙ্কা আর্মির ২২ ব্রিগেডের একজন মেজরের নাম রয়েছে। সরকার-বিরোধী সাপ্তাহিক 'সানডে লীডার' এর উল্লেখ করে ওয়েবসাইটটি বলেছে যে শ্রীলঙ্কার আর্মি ইন্টেলিজেন্স উইং-এর ভূতপূর্ব ব্যক্তিদের জিহাদী দলে ভর্তি করা হচ্ছে।

ইসলামী উগ্রবাদীরা শ্রীলঙ্কায় কতটা প্রতিপত্তি স্থাপন করেছে, তা সম্পূর্ণ রূপেব অধিগম্য না হলেও, বিশেষজ্ঞদের অভিমতে ইসলামি মৌলবাদীরা শ্রীলঙ্কায়, বিশেষ করে পূর্ব বিভাগে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট, রাজনৈতিক দিক দিয়ে না হলেও।

মৈনুদ্দিন আনসারি লস্কর-এর সঙ্গে সংযুক্ত উগ্রবাদী ৮ মে বম্বের নরিম্যান পয়েন্টের এম এল এ হস্টেলে ছিল বলে বম্বে পুলিশ জানতে পারেন। ৯ মে একটি টাটা সুমো গাড়ির গতিরোধ করা হয় মনসাদ-ঔরঙ্গাবাদ হাইওয়েতে কর্ণাটকের কাছে, আরোহী তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গাড়িতে পাওয়া যায় অনেক অস্ত্র-শস্ত্র, ৩০ কেজি আর ডি এক্স এবং ১০টি এ কে ৪৭ রাইফেল। আরোহী আনসারি তার সহযোগীকে নিয়ে পালিয়ে যায়, ড্রাইভার পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পরে ঔরঙ্গাবাদ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। জিজ্ঞাসাবাদে ড্রাইভার আজিজ জানায় ৮ মে রাতে সে নরিম্যান পয়েন্টে 'আকাশবাণী' হস্টেলে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, পরের দিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় ওই জায়গা থেকেই সে আনসারিকে আবার নিয়ে যায়। *(চলবে)*

এবারের নির্বাচনে নিরাপত্তা অন্যতম ইস্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে যেসব ইস্যুগুলি নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে, সেগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন—

জোট সমঝোতা — বর্তমান নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৮৯ সালের নির্বাচনের পর থেকে কেন্দ্রে সরকার গঠনের নির্বাচন পূর্ব জোট বা নির্বাচন পরবর্তী সমঝোতা ধারাবাহিকতা পেয়েছে। সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস, বিজেপি ইত্যাদি দলগুলি এখন আর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারছে না। তাই এই দলগুলির সামনে জোট সরকার গঠন করা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। আঞ্চলিক দলগুলির কাছে এই পরিস্থিতি উৎসাহজনক। কেন্দ্র সরকারে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের লক্ষ্য পূরণের সুযোগ সহ জাতীয় প্রেক্ষাপটে নিজেদের গুরুত্বের বার্তা সারা দেশে পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং জোটসঙ্গীদের শক্তি ও অন্যান্য বিষয়গুলি জোটের প্রধান দলটির নির্বাচনী সাফল্য বা ব্যর্থতার দিক্‌নির্দেশ করবে।

কর্মসংস্থান— বর্তমান বিশ্বে প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার ঝাপ্‌টা ভারতেও লেগেছে। তথ্যপ্রযুক্তি সহ বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রগুলি এখন বেপরোয়াভাবে কর্মী সংকোচন শুরু করেছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মহীন হয়েছেন। বহু লোক কর্মহীনতার আশঙ্কায় ভুগছেন। সব মিলিয়ে কর্ম সংস্থানের ছবি এইসময় আশাব্যঞ্জক নয়। সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি এই নির্বাচনে অন্যতম নির্ণায়ক হবে।

নিরাপত্তা — এবারে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বা সন্ত্রাস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুম্বই ঘটনার পর সন্ত্রাস এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলির এই বিষয়ে মদত দেবার অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও সন্ত্রাস ঠেকানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হল ব্যাপক, সুষ্ঠু ও নিবিড় জনচেতনার প্রসার। কিন্তু বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে অন্যভাবে অর্থাৎ ধরি মাছ না-ছুঁই পানি-র মতো তীব্র প্রতিবাদ এবং কৌশলী মন্তব্য করে গা-বাঁচানো চলছে। সাধারণ সচেতন মানুষ এই বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন।

ভোট ব্যাঙ্ক — স্বাধীনতা উত্তর ভারতের এক বিশেষ নির্বাচনী উপাদান। যা প্রথমে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমে উপজাতি, আদিবাসী, দলিত, সুবিধাভোগী শ্রেণী, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, ছাত্র-যুব বিভিন্ন গোষ্ঠীতে চিহ্নিত হয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দলগুলি এদের ভোট পাবার জন্য সম্ভব অসম্ভব সব ধরনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের আগে দরাজভাবে বিলিয়ে থাকে। বর্তমান সরকার গত সপ্তাহে এই ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির ঠেলায় প্রায় ১৪০টি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই থেকে বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।

বি-পা-স— বিজলী-পানী-সড়ক—এর প্রয়োজনীয়তা গ্রামীণ ভারতে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। শহর এলাকায় এই তিনটির প্রয়োজনীয়তা কম নয়। বিশেষত জলকর, বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর বিল ইত্যাদি নিয়ে লোকের মধ্যে ক্ষোভ আছে। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অন্যতম নির্বাচনী বিষয় হবে। এবারের নির্বাচনে অন্যতম বিষয় নির্বাচন এলাকার পুনর্বিন্যাস। অভিযোগ, ক্ষমতাসীন দলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিন্যাস করা হয়েছে। ঘটনা সত্যি হলে এতদিনের হিসাব নিকাশ পাল্টে যেতে পারে।

দুই প্রধান জাতীয় দলের ২৫ বছরের নির্বাচনী খতিয়ান

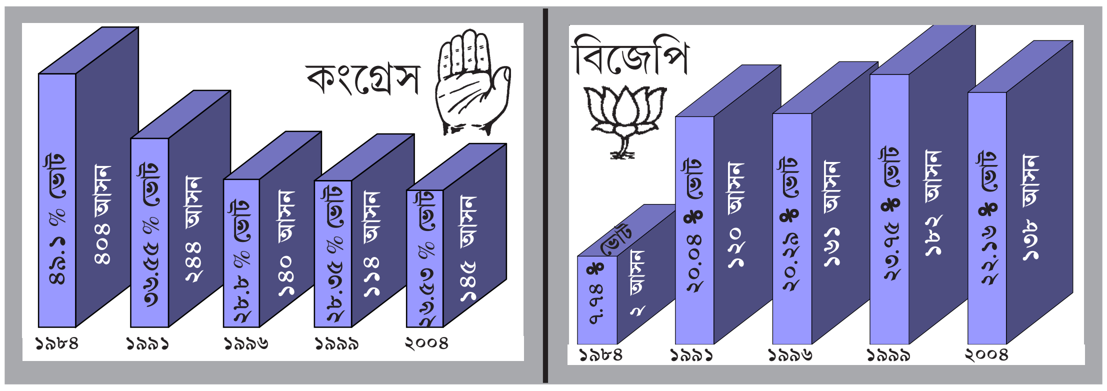

নিবাচর্নী জোট
কে কোথায় দাঁড়িয়ে

ক্ষমতাসীন জোট

✸ কংগ্রেস ✸ আর জে ডি ✸ ডি এম কে ✸ এন সি পি ✸ পি এম কে ✸ জে এম এম ✸ লোক জনশক্তি পার্টি ✸ কেরল কংগ্রেস ✸ অল ইণ্ডিয়া মজলিস-এ ইত্তেহাদুল মুসলিম ✸ ভারতীয় জনশক্তি পার্টি ✸ ন্যাশনাল কনফারেন্স ✸ মুসলিম লীগ কেরল স্টেট কমিটি ✸ ন্যাশনাল লোকতান্ত্রিক পার্টি ✸ রিপাবলিকান পার্টি অফ ইণ্ডিয়া

প্রধান বিরোধী জোট

✸ বিজেপি ✸ শিবসেনা ✸ বিজেডি ✸ অকালী দল ✸ আর এল ডি ✸ অসম গণ পরিষদ ✸ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল ✸ জনতা দল (ইউনাইটেড) ✸ নাগাল্যাণ্ড পিপলস্ ফ্রন্ট

তৃতীয় জোট

✸ সি পি এম ✸ সি পি আই, ✸ ফরওয়ার্ড ব্লক ✸ আর এস পি ✸ তেলেগু দেশম ✸ জনতা দল (সেকুলার) ✸ তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি

জোটে থেকেও জোটের বাইরে সমঝোতার প্রচেষ্টায়

- ✸ এন সি পি — শিবসেনা ও সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে।
- ✸ আর জে ডি — বামপন্থী ও সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে।
- ✸ এ আই ডি এম কে — কংগ্রেসের সঙ্গে।
- ✸ জনতা দল (সেকুলার)—কংগ্রেসের সঙ্গে।

নির্বাচনের সাতকাহান

- ✶ নির্বাচক — ৭১ কোটি ৪০ লক্ষ
- ✶ নির্বাচন আধিকারিক /কর্মী — ৪০ লক্ষ
- ✶ নিরাপত্তা কর্মী — ২১ লক্ষ
- ✶ ভোটদান কেন্দ্র — ৮ ল(২৮ হাজার
- ✶ ভোটযন্ত্র (ই ভি এম) — ১১ লক্ষ
- ✶ মোট আসন — ৫৪৩
- ✶ সচিত্র পরিচয়পত্রযুক্ত ভোটার তালিকা অনুসারে ভোট হবে ৫২২টি আসনে।
- ✶ ৪৯৯টি আসনের নির্বাচন এলাকার পুনর্বিন্যাস হয়েছে।
- ✶ নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ১৬ই মে, ২০০৯।
- ✶ চতুর্দশ লোকসভার (বর্তমান লোকসভা) মেয়াদ শেষ হবে ১ জুন, ২০০৯।
- ✶ পঞ্চ দশ লোকসভা গঠিত হবে ২ জুনের মধ্যে।
- ✶ অরুণাচল প্রদেশে তিনটি ভোটদান কেন্দ্রের প্রতিটির ভোটদাতার সংখ্যা মাত্র তিন।
- ✶ ছত্তিশগড়ে একটি ভোটদান কেন্দ্রের ভোটদাতা মাত্র দু'জন।
- ✶ মাত্র একজন ভোটদাতার ভোটকেন্দ্রটি গুজরাটের জুনাগড় জেলার গীর অভয়ারণ্য সন্নিহিত বানেজ-এ।

২০০৪-এর লোকসভা ভোট
কোন দলের কত আসন

কংগ্রেস ও সহযোগী দল

- ✸ কংগ্রেস — ১৪৫
- ✸ সমাজবাদী পার্টি — ৩৬
- ✸ আর জে ডি — ২৪
- ✸ ডি এম কে — ১৬
- ✸ আর পি আই (এ) — ১
- ✸ আর এল ডি — ৩
- ✸ লোক জনশক্তি — ৪
- ✸ জে এম এম — ৫
- ✸ এম ডি এম কে — ৪
- ✸ পি এম কে — ৬
- ✸ টি আর এস — ৫
- ✸ রাষ্ট্রবাদী কংগ্রেস পার্টি — ৯

বিজেপি ও সহযোগী দল

- ✸ বিজেপি — ১৩৮
- ✸ শিবসেনা — ১২
- ✸ বিজু জনতা দল — ১১
- ✸ টি ডি পি — ৫
- ✸ অকালি দল — ৮
- ✸ জে ডি (ইউ) — ৮
- ✸ মণিপুর ফ্রন্ট — ১
- ✸ আই এফ ডি পি — ১

অন্যান্য দল

✸ সি পি এম ৪৩ ✸ সি পি আই ১০ ✸ বি এস পি ১৯ ✸ জে ডি (এস) ৩ ✸ আর এস পি ৩ ✸ অসম গণ পরিষদ ২ ✸ এ আই এফ বি ৩ ✸ এ আই এম আই এম ১ ✸ এ আই টি সি ২ ✸ বি অন পি ১ ✸ জে কে এন ২ ✸ জে কে পি ডি পি ১ ✸ কেইসী ১ ✸ এম এন এফ ১ ✸ এম ইউ এল - ১ ✸ এন এল পি ১ ✸ এন পি এফ ১ ✸ এস ডি এফ ১ ✸ এস জে পি (আর) ১ ✸ নির্দল ৫

লোকসভা
কোন রাজ্যে কত আসন

- ✸ অন্ধ্রপ্রদেশ — ৪২
- ✸ ত্রিপুরা — ২
- ✸ অরুণাচল প্রদেশ — ২
- ✸ অসম — ১৪
- ✸ বিহার — ৪০
- ✸ ছত্তিশগড় — ১১
- ✸ গোয়া — ২
- ✸ গুজরাট — ২৬
- ✸ হরিয়ানা — ১০
- ✸ হিমাচলপ্রদেশ — ৪
- ✸ জম্মু-কাশ্মীর — ৬
- ✸ ওড়িশা — ২১
- ✸ ঝাড়খণ্ড — ১৪
- ✸ কর্ণাটক — ২৮
- ✸ কেরল — ২০
- ✸ উত্তরপ্রদেশ — ৮০
- ✸ মধ্যপ্রদেশ — ২৯
- ✸ মহারাষ্ট্র — ৪৮
- ✸ পাঞ্জাব — ১৩
- ✸ তামিলনাড়ু — ৩৯
- ✸ রাজস্থান — ২৫
- ✸ নাগাল্যাণ্ড — ১
- ✸ দিল্লী — ৭
- ✸ উত্তরাখণ্ড — ৫
- ✸ মণিপুর — ২
- ✸ মেঘালয় — ২
- ✸ মিজোরাম — ১
- ✸ সিকিম — ১

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

- ✸ দমন ও দিউ — ১
- ✸ লা(দ্বীপ — ১
- ✸ পণ্ডিচেরী — ১
- ✸ চণ্ডীগড় — ১
- ✸ দাদরা ও নগর হাভেলি — ১
- ✸ আন্দামান ও নিকোবর — ১

চিঠিপত্র

কলকাতায় মুসলিমবহুল এলাকা

কলকাতায় হিন্দুদের দুরবস্থা— কথাটা একটু অদ্ভুত লাগতেই পারে শুনতে। কেননা পাঠকরা মনে করতেই পারেন যে কলকাতা তো আর লাহোর কিংবা চট্টগ্রাম নয়। তবে কলকাতায় হিন্দুদের দুরবস্থা, এ আবার কেমন কথা।

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটিই কিন্তু সত্যি। যদি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কিছুটা তুলে ধরি পাঠককুলের সামনে, তবে মনে হয় না কোনও অসুবিধা হবে মূল বিষয়টি উপলব্ধি করতে। আমার বাড়ি রাজাবাজার অঞ্চলে। জন্ম থেকেই আমি সেখানেই বড় (কলেজের ছাত্র) হয়েছি। আমাদের বাড়ির তিনদিকেই মুসলমানদের বসবাস। বাড়ির পিছন দিকে শুধু রয়েছে হিন্দুপল্লী কিংবা তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ, বিশেষ শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী পল্লী বললেও খুব একটা ভুল হবে না বলেই মনে হয়। মুসলমানরা প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়ির ছাদে গো-মাংস ছোঁড়ে। এতো কিছুই নয়, যখন শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে পুজো দিতে যাই তখনও সেই গো-মাংস ছুঁড়ে আমাদের ধর্মকে অপমান করা হয়। এছাড়া প্রায়ই আমাদের হিন্দুধর্ম তুলে কটুক্তি করে।

কিন্তু কার কাছে এর বিরুদ্ধে নালিশ জানাব—পুলিশ—সে তো চোখ থেকেও অন্ধ, হিন্দু হয়েও অহিন্দু। আর সত্যিই পুলিশকে দোষ দিয়েই বা কী লাভ? আসল গলদ তো রয়েছে বাংলায় ক্ষমতায় থাকা দলের নীতিতে। এই দল মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি কপচালেও প্রকৃতপক্ষে যে ইসলামি মৌলবাদের সমর্থক এ বিষয়ে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এখন কলকাতার রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস ইত্যাদি অঞ্চলে যে সকল হিন্দুরা রয়েছে তাদের সকলেরই অবস্থা যে আমাদের মতো অথবা এর থেকেও বেশি করুণ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই রকম মদত বাংলার বামপন্থী সরকার মুসলিমদের দিতে থাকলে এই সব অঞ্চলে আর কতদিন যে হিন্দুরা বাস করতে পারবে তা সত্যিই এক বিশাল প্রশ্ন?

শমীক মিত্র, রাজা রামমোহন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পদবী চুরি

শিবাজী গুপ্ত ‘পদবী-চোর....’ শীর্ষক নিবন্ধে (স্বস্তিকা ১২/১/০৯) বলেছেন—জওহরলাল নেহরুর জামাতা ফিরোজ গান্ধী আদতে মুসলমান ছিলেন। মতিলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ নওয়াব খান নামে এলাহাবাদের এক সুন্নী মুসলমান মদ বিক্রেতার সাথে এক পার্শী মহিলার শাদি হয়েছিল; তাঁদেরই ছেলে ঐ ফিরোজ গান্ধী। ভাবী জামাতার অস্বস্তিকর মুসলমানী পরিচয় নিয়ে বিব্রত নেহরু গান্ধীজির শরণাপন্ন হলে, গান্ধীজি ‘জন্মসূত্রে পার্শী’ মায়ের সূত্র ধরে ফিরোজের জন্য একটি পার্শী পদবী ‘ঘ্যান্ধী’ (Ghandhi) ঠিক করে দিয়েছিলেন। নেহেরুর সেটি মনঃপূত হয়নি। তিনি ভাবী জামাতার জন্য শেষ পর্যন্ত ‘গান্ধী’ পদবী সাব্যস্ত করেন। সেই থেকে, নওয়াব খানের পুত্র ফিরোজ খান ‘ফিরোজ গান্ধী’ হয়ে যান। অপরপক্ষে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নিমাই সাধন বসু-র ‘আমি ইন্দিরা গান্ধী’ পুস্তক সূত্রে জানা যায়, ফিরোজ ১৯১২ সালে এলাহাবাদের এক পার্শী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; পিতা জাহাঙ্গির ফারদুনজি, মাতা রত্তিবাঈ গান্ধী। এখানে দেখা যাচ্ছে, ফিরোজ তাঁর পিতৃ-পদবী ‘ফার-দুনজি’ ব্যবহার না করে মায়ের পদবী গ্রহণ করেছিলেন। কবে এবং কেন জানা নেই। এখানে স্বাভাবিক প্রশ্ন, ফিরোজের মাতৃকুলের ‘গান্ধী’ পদবী থাকতেও গান্ধীজি মাথা ঘামিয়ে একটি পার্শী পদবী ‘ঘ্যান্ধী’ বাছতে যাবেন কেন?

ডঃ বসু তাঁর পুস্তকের ‘প্রসঙ্গ কথা’য় বলেছেন—‘ইন্দিরা-ফিরোজ’ সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রচুর গল্প প্রচলিত থাকলেও তার বেশির ভাগই অলীক, অর্ধসত্য ও অনুমানভিত্তিক।’ একথা ভাবা অযৌক্তিক হবে না, শ্রীগুপ্তের কাহিনীটিও একই গোত্রজ। তিনি তাঁর কাহিনীর সমর্থনে, এমনকী ইংরেজি উদ্ধৃতিটিরও অত্যাবশ্যক সূত্র উল্লেখ করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর আগে, সাপ্তাহিক খক্তজক্কন্দন্দ্বক্ত-এ প্রয়াত ডি.পি. ভাটিয়া-র Cabbages of Kings কলামে ‘সূত্র-বিহীন’ এই কাহিনী পড়েছিলাম।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

কমিউনিস্টদের রাজনীতি

২২শে ডিসেম্বর’০৮ স্বস্তিকা চিঠিপত্র কলমে, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিঠিটি পড়লাম। হিন্দু কমিউনিস্ট নেতারা মুসলিম প্রেমী। ভোটের স্বার্থে নিজেদের গদি কায়েমের উদ্দেশ্যেই মুসলিমদের নিয়ে রাজনীতি করছে। হিন্দুস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এসেও মুসলিমদের নিয়েই রাজনীতি বনাম দলবাজি করছে। যদি পশ্চিমবঙ্গটা মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যায়, তবে আমরা যাবো কোথায়? দন্ডকারণ্যে না, মরিচঝাঁপিতে? কমিউনিস্টরা বুঝতে পেরেছে আমাদের এখন বিদায়ের পালা। সেইজন্য দেশ বিদেশের বড় বড় শিল্পপতিদের জমি দিয়ে শিল্প গড়িয়ে তাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পাবার উদ্দেশ্যেই শিল্পের জন্য পাগল হয়েছে। কমিউনিস্টরা কায়েমী স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে শিল্পের খোয়াব দেখাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এত বোকা নয়। শিল্পের খোয়াব আর দেখবে না। কমিউনিস্টরা জানে শিল্প ধ্বংস করতে। এরা জানে বেকার বানাতে। বেকার বানিয়ে নিজেদের দল ভারি করতে। এই ব্যাপারে কমিউনিস্ট দল খুব পটু, কিন্তু এই পটুতা বোকামী ছাড়া কিছু নয়। কমিউনিস্ট দলের মদতেই ভারত দ্বিখন্ডিত হয়েছে। আবার এদের মদতেই পশ্চিমবঙ্গটাও বোধ হয় দ্বিখন্ডিত হবে।

চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্তী, নর্থ বঙ্গাইগাঁও, অসম

জনসমীক্ষার ইঙ্গিত

পশ্চিমবঙ্গের দুটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ এইরকম—জনসমীক্ষার ইঙ্গিত অনুসারে প্রাচীন ভারতের প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত বর্তমান ভারত রাষ্ট্রও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এর মধ্যে সৃষ্টি হবে অজস্র স্বাধীন রাষ্ট্রের ইত্যাদি, (বর্তমান ১২/৮/১৯৯৭)।

যে সময়ে ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হচ্ছে; ঠিক সেরূপ সময়ে সিমি প্রচার করছে—“একদিন গোটা পশ্চিমবঙ্গই মুসলিম রাজ্য হয়ে যাবে এবং এর মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান ইত্যাদি (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১/১/২০০২)।”

এরূপ পরিস্থিতিতেও সতর্কতা কই?

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কিন্তু আমাদের বিশেষত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ভোট প্রার্থীদের সে ভয়ও নেই। হায় দুর্ভাগ্য! কথায় আছে মরণ নিকটে যার কি করে ঔষধে, না রহে রাবণ রাজা মন্দোদরীর প্রবোধে। আমরা অসতর্ক, অদূরদর্শী, তাই এখন মরণের মুখোমুখি।

হৃদয় রঞ্জন ভট্টাচার্য, ভদ্রকালী, হুগলী

কলকাতার সাম্প্রদায়িকতা ঃ সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

জনমত

যোহান হ্যারির নিবন্ধ নিয়ে দি স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রকাশক আনন্দ সিনহা ও সম্পাদক রবীন্দ্রকুমারের গ্রেপ্তার ও কলকাতা পুলিশের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, কলকাতার কপালে আর একটা কলঙ্কচিহ্ন হয়ে রইল। ইংরাজী স্টেটসম্যান পত্রিকায় গত ৫ই ফেব্রুয়ারি “কেন আমি এই নির্যাতক ধর্মগুলিকে শ্রদ্ধা করবো?”.... শীর্ষক একটি নিবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়। লন্ডনের বিখ্যাত ‘দি ইনডিপেন্ডেন্ট’ পত্রিকার স্তম্ভলেখক যোহান হ্যারি ওই নিবন্ধের লেখক (২৮/০১/০৯)। বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় বিভেদ, আধুনিক সমাজে নানা ধার্মিক কদাচার এবং সংবাদ জগৎ সহ নিরপেক্ষ নাগরিক জীবনে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নানা আক্রমণ, এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ইহুদি, খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মের নানা বিতর্কিত বিষয় এই নিবন্ধে ঠাঁই পেয়েছে। ধর্মের নামে হত্যা ও রাজনীতি, কোন ধর্ম-সংস্থাপকের ৫৩ বৎসর বয়সে ৯ বছরের বালিকার সঙ্গে সহবাস, ধর্ম-সংস্কারপন্থীদের নির্বিচার নির্যাতন উক্ত নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বের বহু মানুষ নিবন্ধটির সমালোচনা বা প্রশংসা করেছেন। যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তি ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার ওয়েবসাইট খুলে সেটি পাঠ করতে পারেন।

(www.independent.co.uk)। কিন্তু বিশ্বের কোথাও কলকাতার অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মৌলবাদীদের মতো পথে নেমে তারা পেশীশক্তির ফলাও প্রদর্শন করেনি। এই বিষয়ে অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে গ্রেপ্তার হতে হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ তাঁর পত্রে (দৈনিক স্টেটসম্যান, ২২/০২/০৯) কলকাতায় এই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ধারাবাহিক পরম্পরা ও বর্তমান স্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। ‘সাম্প্রদায়িক শক্তির কবলে’ কলকাতার বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে তিনি ‘লাল, কালো, সবুজ বা তেরঙ্গা’র প্রশ্রয় বা ‘৩২ বছরের বাম শাসনে কলকাতা’ ও সর্বত্র নির্লজ্জ মুসলমান তোষণকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ‘দেশের সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি কবলিত শহরে পরিণত’ কলকাতার এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য অতি সরল।

হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, আমরা মুক্তবুদ্ধির এই লীলাক্ষেত্রে কোনোভাবেই তসলিমাকে ঠাঁই দিতে পারিনি। ২১শে নভেম্বর, ২০০৭-এ তসলিমার বিতাড়ন নিয়ে কলকাতার রাজপথে যে নৈরাজ্য ও ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শানের মহড়া চলেছিল, তাতে আইনজীবী এক কংগ্রেসী আলি-ভাইয়ের জোরালো মদত ছিল। তাকে দল তাড়িয়েও দিয়েছিল। কলকাতার জামাতপন্থীদের নয়নমণি টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি তসলিমাকে কোতলের জন্য ৫ লাখ টাকার ইনাম ঘোষণা করেছিলেন। তাকে কেউ গ্রেপ্তারের সাহস দেখাতে পারেনি। বরং পরে সেই ইমামের সঙ্গে মমতাদেবীর কোলাকুলির ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং মুম্বাই হামলায় (১৬/১১) পাঁচজন ইহুদী হত্যার বদলায় প্যালেস্টাইনের উপর ইজরাইলের নির্মম আক্রমণের জন্য ইহুদীদের সর্বনাশ কামনায় জামাতপন্থীরা কলকাতার পথে নেমেছে। এরা মুম্বাই হামলায় নিহত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের আত্মার শান্তি কামনায় পথে নামতে পারে না। এখন এরাই যোহান হ্যারির নিবন্ধের প্রতিবাদে জনজীবন স্তব্ধ করার ফন্দি আঁটে। এদেরকে ফিদা হুসেনের নগ্ন সরস্বতী বা মৈথুনরত হনুমান-সীতার চিত্র আঁকার প্রতিবাদে পথে নামতে দেখি না। ......এ সবই বাংলার রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের চরম কুফল। কিন্তু বাংলার যে সাংবাদিক বন্ধুরা ইতালীয় বংশোদ্ভূত ভারত ত্রাণকর্ত্রীর মালদা আগমনের পূর্বেই তাঁর ভূরিভোজের বিস্তারিত বিবরণ, অথবা চিত্রজগতের কোনও স্বপ্নসুন্দরী নায়িকার আগাম গর্ভপাতের সংবাদ বা এক রাজনৈতিক দিকপালের গোয়া সমুদ্র সৈকতে ধনী মহিলার সাথে অবসর যাপনের খবর আগাম কভার করার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেন, তারা কলকাতা তথা জনগণকে সচেতন করার বিষয়টিকে আদৌ গুরুত্ব দেন না। তাই তাদের কাছে স্টেটসম্যান হাউসে হামলা বা ডায়মন্ডহারবার ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর সংলগ্ন মাঠে গোমাংস ছড়ানো প্রভৃতির ‘স্টোরি’ বা ‘বাইট’, সবই অচল পয়সা। এক্ষেত্রে এদের কাছে তিন বাঁদরের গপ্পোটাই বেশ ভালো। পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে উঠুক। আমরা কানে চোখে ও মুখে হাত দিয়ে থাকি!!

শুনেছি কাক নাকি কাকের মাংস খায় না। কিন্তু সাংবাদিকরা সাংবাদিকদের মাংস খায়। তাই স্টেটসম্যানের উপর মৌলবাদীদের এই নির্লজ্জ আক্রমণ বাংলার সংবাদ মাধ্যমে ঝড় তুললো না। ভাঙচুর হয়েছে তো স্টেটসম্যান ভবনে, হামলা তো হয়েছে ধর্মতলায়, গ্রেপ্তার হয়েছে তো স্টেটসম্যানের প্রকাশক আর সম্পাদক। তাই বিষয়টি নিয়ে আমাদের না শুনলে, না দেখলে, না বললে—কিছু যাবে আসবে না।.......একটা পত্রিকায় স্টেটসম্যানের উপর এই আক্রমণের প্রতিবাদে একটা জোরালো সম্পাদকীয় লেখা হলো না। বাংলার সংবাদ মাধ্যম প্রতিবাদে একযোগে পথে হাঁটলো না। কেউ সাহস করে যোহান হ্যারির লেখাটার বাংলা তর্জমা করলো না। জনগণ জানতে পারলো না, কি লিখেছেন যোহান হ্যারি? বাঙালী সমাজ শুধু জানলো, তারা ধর্মান্ধ মৌলবাদের কাছে পরাজিত। একমাত্র ব্যতিক্রমী পত্রিকা হিসাবে স্বস্তিকা ‘বাংলা সংবাদ মাধ্যমের দাঙ্গার খবর চেপে যাওয়ার’ এই দ্বিচারিতা নিয়ে, ২৩শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রথম পাতায় যে শীর্ষ সংবাদ প্রকাশ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আজ শাঁওলী মিত্র, শুভাপ্রসন্ন, মহাশ্বেতা দেবীরা রিজওয়ানুর, অরিন্দম, ভাষা দিবস, কেমিক্যাল হাব, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আর পারস্পরিক পৃষ্ঠ কন্ডুয়নের আবর্ত থেকে বেরোতে পারছেন না। তাঁরা স্টেটসম্যানে লিখবেন, কিন্তু স্টেটসম্যানের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু লিখবেন না। ধন্য বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল—ধন্য বাংলার সাংবাদিক মহল। তবে তাঁদের এই কালিদাসী আচরণের জন্য ভবিষ্যতে অনেক দুঃখ অপেক্ষা করে আছে।

গত ১৮/০২/০৯ তারিখে কিছু প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী কলকাতার রানী রাসমণি মূর্ত্তির পাদদেশে একটি প্রতিবাদ সভা করেন। স্টেটসম্যানের উপর আক্রমণ ও কলকাতায় সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসনের নিন্দা করেন। সেই খবর কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি না। বাংলার সংবাদ মাধ্যমে ৪০০ জন গুন্ডার পথ অবরোধ, পত্রিকা অফিসে ভাঙচুর বেশী গুরুত্বের খবর হয়। তার বিরোধিতায় ৪০ জন বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ কোনও খবরই হয় না। আমাদের চিন্তার প্রকরণে পরিবর্তন না আনলে, আগামী দিনে এই বাংলার সমস্ত মুক্তবুদ্ধির মৌলবাদ বিরোধী মানুষ ও গণতন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার সংবাদ মাধ্যমের উপর আরও ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসবে, স্টেটসম্যানের উপর আক্রমণের পথ ধরেই। মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমের সংগ্রামে পিছু হটার জায়গা নেই। প্রয়োজন, বলিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যমের— দুর্বল-ভীরু সংবাদ মাধ্যমের নয়।

পরম্পরা

যুগাবতার শ্রীচৈতন্যই পথ — আজও

নন্দলাল ভট্টাচার্য

লীলাতরঙ্গের এও এক অপূর্ব বিভাস। একদা, এক তিনি, বাসনা হল বহু হবার। বহু হলেন। আবার সেই বহুরূপেই নরলীলায় মাতোয়ারা হবার ইচ্ছা হয় তাঁর। সেই ইচ্ছাতেই তিনি অবতীর্ণ হন এই মরধামে। শুধু লীলারঙ্গে মাতা নয়, সেইসঙ্গে অধর্মের বিনাশ, ধর্মের প্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য। তাই বা কেন, যুগ বিবর্তনে যে নতুন নতুন ভাব ও বিকার দেখা যায়, তারও নিরসন করে যুগোপযোগী সাধন পথ ও রূপের নির্দেশ দেওয়ার জন্য তিনি হন আবির্ভূত। তাঁর এই আবির্ভাবলীলার একটি অপরূপ বৈশিষ্ট্য, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।' আপন জীবনে সেই সাধন ধারার প্রকৃষ্ট রূপটিকে প্রতিভাত করে জীব ও জগতের কাছে তিনি উপস্থাপনা করেন নতুন দৃষ্টান্তের।

এই অবতারতত্ত্বের ধারাতেই দ্বাপরে তিনি আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণরূপে। তিনি কৃষ্ণ, তিনিই স্বয়ং ভগবান। সেই ভগবানের ব্রজ বা বৃন্দাবনলীলা এক চিরন্তন, শাশ্বত, নিত্যলীলা। নিত্য বৃন্দাবনে সে লীলা তিনি করে যান বিরামহীন ভাবে। জীবের মনোজগৎ ব্যাপ্ত সেই নিত্যধাম ও লীলার রসে। 'এখনও তেমনি ব্রজের মাঝে/শ্যামল রায়ের বাঁশরী বাজে/সেই শোনে যার শ্রবণ আছে।'—দ্বাপরে বৃন্দাবন লীলার যেখানে শেষ, কলিতে ঠিক সেখান থেকেই শুরু নদীয়ায় নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা। বৃন্দাবন লীলায় ছিল ঐশ্বর্যের প্রকাশ। সাধনধারাও ছিল তাই। এবার নবদ্বীপ লীলায় তিনি প্লাবন বহালেন ভক্তিধারার। সাধন পদ্ধতির করলেন সহজীকরণ। শুধু নাম জপেই জীবের মুক্তি—কলিযুগে 'হরিনাম' মহামন্ত্রেই লাভ হয় তাঁর সাযুজ্য—একথাই প্রকাশ করলেন তিনি তাঁর লীলা বিভঙ্গে।

অপূর্ব এ লীলা প্রকাশ। কৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলার মধ্যে রয়েছে অপরূপ এক ভাব প্রকাশ। আবির্ভাব লগ্নটির কথা ভাবা যাক। দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন তিনি কৃষ্ণাষ্টমীতে। আকাশে তখন চাঁদ অপ্রকাশ। আবার কলিতে তিনি যেদিন এলেন গৌরাঙ্গ-শ্রীচৈতন্য রূপে, সেদিন পূর্ণিমা, কিন্তু চন্দ্রে সেদিন লেগেছিল গ্রহণ। তাঁর আবির্ভাব মুহূর্তে আকাশে চাঁদ হয় অন্তর্হিত। লীলালগ্নে এটাই ছিল স্বাভাবিক। ধরার বুকে তিনি স্বয়ং যখন অবতীর্ণ, তখন তো আকাশের চাঁদের আর নেই কোনও প্রয়োজন। আসল হীরের অযুত-সহস্র বিচ্ছুরণ ধারায় জগৎ যখন প্লাবিত, আমোদিত, এক স্নিগ্ধভাবে সিক্ত, তখন কী আর দরকার নকল হীরের?

ধর্ম সংস্থাপনে, কলিযুগের উপযুক্ত সাধনরীতি প্রবর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে তিনি নেমে এসেছিলেন মাটির এই পৃথিবীতে। তাঁর নবরূপে ক্ষণে ক্ষণে মানুষ পথহারা হয়েছে বিভ্রমে। কিন্তু স্বাভাবিক করুণায় বিভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখিয়ে তিনি যাচ্ছেন, সব ছেড়ে একবার শুধু 'বদন ভরে বলো হরিবোল'—তাতেই সার্থক তোমার মানবজন্ম। তাতেই পাবে মুক্তি। পাবে আমাকেও। লীন হবে পরব্রহ্মে।

শ্রীচৈতন্যলীলার এই স্বরূপটিকে সুচারুরূপে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন কবিরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস। আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদটিতে অবতারলীলার কারণ এবং রূপটিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে—স্বয়ং ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয়েই। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন একটি অপূর্ব কথার। কথাটি হল 'সাযুজ্য'। বিভিন্ন রূপকে সামনে রেখে যে সাধনধারা তাতে সেই সেই ধরনেরই ফল লাভ হয়। ঐশ্বর্য রূপটির সাধারণ মেলে ঐশ্বর্য বা সার্ষ্টি, মেলে তাঁরই রূপ বা সারূপ্য, মেলে তাঁর লোক বা সামীপ্যও। এত সব মিললেও মেলে না যা, তা হল 'সাযুজ্য'। অর্থাৎ লীন হওয়া যায় না তাতেই। কিন্তু ভক্তি মার্গে, যুগের সঙ্গে তাল রেখে বা তার প্রয়োজনের কথা

ভেবে প্রচলন করলেন নাম সংকীর্তন। নিজের জীবনলীলার প্রকাশ করলেন কিভাবে প্রেমে জীব হবে মত্ত। কেমন সমর্পিত ভক্তির মধ্য দিয়েই মিলবে তাঁর সাযুজ্য—মিলেমিশে একাকৃত হওয়া যাবে তাঁতেই। আধ্যাত্মিকতার বিচারে এ এক অপরূপ প্রকাশ। এইভাবে ঈশ্বরময় হয়ে যাবার পথ শ্রীচৈতন্যের আগে আর কোনও অবতারই দেখাননি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথা, নিজে আচরণ না করে সনাতন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যায় না। গীতায় তিনি বলেছেন, ধর্মসংস্থাপনায় আমার আবির্ভাব। তাই আমি যদি ধর্মানুষ্ঠান না করি, তাহলে জগৎ তো উৎসন্নে যাবে। জীব তাহলে শিখবে কী?

ভাগবতেও ধবনিত হয়েছে একই কথা, মহৎ ব্যক্তিরা যেমন আচরণ করেন, সাধারণ মানুষই সেই পথেই চলে। তাঁরা যাকে প্রমাণ হিসাবে মেনে নেন, সাধারণ মানুষও নির্দ্বিধায় তাকেই মানে প্রমাণ হিসাবে। মহাভারতের কথা, মহাজনের পথই পথ। আর সেই পথ দেখাতেই শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব—এই কলিযুগে।

কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম-ধন প্রেমভক্তি। এই ধনের ভান্ডারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ছাড়া আর কেউ এই ধন দিতে পারেন না বলেই, তিনি সপরিকর ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে প্রচার করবেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্তেরই পরিণতি শ্রীচৈতন্যলীলা। তিনি আবির্ভূত হলেন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। জীবনের প্রথম ২৪টি বছর তিনি সেখানেই রইলেন। মাঝে দুবার—একবার পূর্ববঙ্গে যান তাঁর বিদ্যাধন নিয়ে, আরেকবার যান গয়ায় পিতৃঋণ শোধের জন্য। তাছাড়া বাকি সময় কাটে তাঁর এখানে বাল্য-যৌবনলীলায়।

এই লীলাকালেই নবদ্বীপ তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন নাম ধর্ম। নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম অহিংস গণআন্দোলনের মাধ্যমে বাধ্য করলেন শাসক শক্তিকে তাদের ধর্মবিরুদ্ধ অনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে। বলা যায়, গৌরাঙ্গ লীলার নামকীর্তন প্রচার, কাজিদলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার তাঁর যৌবন লীলার স্মরণীয় ঘটনা। যার মধ্য দিয়ে কখনও ঐশ্বর্যলীলার প্রকাশ ঘটলেও ভক্তিপথে, নামকীর্তনের মাধ্যমে শ্রেয়র সন্ধানই ছিল আধ্যাত্মিতার ইতিহাসের বেশ কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

গৌরাঙ্গলীলায় নামকীর্তনের সূচনা করলেন তিনি। আর শ্রীচৈতন্যলীলার সেই নাম কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভক্তিরও চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন। আরও আশ্চর্য, বঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তিনি এবার বেছে নিলেন নীল সাগরের তীরে নীলাচল ধামকে। আর সেই নীলাচললীলার অন্তর্লীন হবার আগে দক্ষিণ ভারত এবং শ্রীকৃষ্ণের নীলাচল সেই বৃন্দাবন সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থে গিয়ে প্রেমভক্তির প্রচার করলেন তিনি।

ভক্তের আহ্বানেই ভগবান অবতীর্ণ হন কখনও অংশ, কখনও বা পূর্ণাবতাররূপ। এবারও অদ্বৈতপ্রভুর আহ্বানেই যুগাবতার হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। যুগবতার হিসেবে আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে যে নামকীর্তন ও প্রেমভক্তির প্রবর্তন করেন তিনি, আজও নানা সংকট বিদ্ধ এই বিশ্বে সেটাই একমাত্র পথ। প্রেম-ভক্তিই আনে শান্তি। শান্তিই উপহার দেয় সুন্দর জীবন—যে জীবন কাম্য সকলেরই।

তাই পথ তিনি। পথিকৃত তিনি। তিনিই দিশারী—তিনিই অনন্তজীবনের প্রতীক।

শ্রীচৈতন্যের দান ও অবদান

ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ধমানের অতি প্রাচীন কালনা শহরে মহাপ্রভুর মন্দিরে আসার পথে বেলে পাথরের শিলায় বাঁধানো একটি সুপ্রাচীন তেঁতুল গাছ আছে। এই গাছটি প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরেরও বেশি প্রাচীন। মহাপ্রভুর বাড়ি বলে খ্যাত গৌর-গৌরীদাস মন্দিরে বিশাল প্রাঙ্গণে পুণ্য ভাগীরথী নদীর কাছে এই গাছটি আজও সারা বছর ফুলে ফলে পাতা ও গাছের ঝুড়িতে সমৃদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের লক্ষ লক্ষ কলিহত ভক্ত আজও এই সুদুর্লভ এই মহাপুণ্যময় গাছকে পূজা করে পুণ্য লাভ করে।

শ্রীভগবান যখন মর্তে প্রকট হন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রাণ স্বরূপ পার্ষদ পরিকরদেরও সঙ্গে নিয়ে আসেন। ষড়গুণ সম্পন্ন (শ্রী, হ্রী, ধী, বীর্য, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্য) ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগে ব্রজের অভিন্নপ্রাণ 'সুবলসখা' শ্রীশ্রী গৌরীদাস ঠাকুর এবং সপ্ত গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, কমলাক্ষ' মিশ্র অদ্বৈতাচার্য আদিকে প্রকট করে মর্তের জীবের হৃদয়ে প্রেম ভক্তির অমৃত বীজ বপন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় নর্মসখা সুবলই গৌরলীলার ঠাকুর গৌরীদাস পন্ডিত গোস্বামী। কবি কর্ণপুর তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়' বলেছেন,—

"সুবলো যঃ প্রিয়প্রেষ্ঠঃ সব গৌরী দাস পন্ডিতঃ।"

গৌরীদাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের চেয়ে এক বছরের বড়। ১৪০৮ খৃস্টাব্দের বসন্তে শান্তিপুর শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যের পুণ্যপ্রাঙ্গণে যখন সাধনভজন কীর্তনের মহাআয়োজনে শান্তিপুরের আকাশ বাতাস সঙ্গীতমুখর বৈষ্ণব সুরভিত মগ্ন, সেই আনন্দ-উৎসবে নবদ্বীপ চন্দ্রমা মানে-নিমাই এর বার বার যেন ছন্দ কেটে যায়। তিনি এক ও অনন্যমনা হতে পারছেন না। হঠাৎ তিনি তাঁর কীর্তন সহচর বাসু ঘোষকে টেনে সোজা হরি নদীর ঘাটে। সেখানে এসে দেখেন ফেরি মাঝি কেউ নেই। কেবল মাত্র একটা ডিঙি নৌকা রয়েছে। ওপারে দেখা যায়, অম্বিকা কালনা নগরী। তিনি লাফ দিয়ে ডিঙিতে চড়ে বাসুকে নিয়ে বৈঠা বেয়ে চললেন দ্রুত। কি যেন এক অদৃশ্য টানে তেঁতুলতলার ঘাটে পৌঁছে দৌড়ে চলে গেলেন গোধূলি-আঁধারে। হাতের বৈঠা হাতেই রয়ে গেছে। সন্ধ্যা প্রদীপ দিতে এসে গৌরীদাস গোস্বামী স্নিগ্ধ আলোয় ওই শালপ্রাংশু মহাভুজ জ্যোতির্ময় দীপ্ত মূর্তি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করতে যান। নিমাই প্রভু তার আগেই গৌরীদাসকে তাঁর প্রশস্ত বক্ষে টেনে নিলেন।

বাংলায় সে সময় ছিল সুলতান হুসেন শাহের শাসন। যদিও তিনি উদার এবং অমুসলমান অথচ গুণী-পন্ডিতদের সমাদর করতেন, তাঁদের যোগ্য কাজে মর্যাদার সঙ্গে স্থান দিতেন, কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রচুর সম্মান দিতেন, তবু সে যুগে মুসলমানী শাসন ছিল অত্যাচারের, ধর্মান্ধতার, ধর্মান্তরিত করার এক ভয়ানক পরিবেশ। সেখানে ছিল আগে কোতল, তারপর শুনানীর পালা। তার সঙ্গে ছিল তান্ত্রিকদের ভয়াবহ নারকীয়তা। উচ্চবংশের নাম করে এক প্রচন্ড নারকীয় ক্রিয়া কর্ম, পঞ্চ মকারের হল্লা, আগমবাগীশ দলের ভৈরবী ক্রিয়ার নামে শূদ্র বর্ণের বাড়ির বৌ-ঝিদের জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রতিকারহীন নিঃসহায়তা ও শাস্তির ভয়ে সমাজের এই অপকীর্তি দেখেও চুপ করে থাকা, ভুবনজয়ী পন্ডিত অথচ বীরচূড়ামণি নিমাইকে সরাসরি বিদ্রোহী করে তুলেছিল। হাজার হাজার হীনবর্ণের মানুষ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিচ্ছিল—কেবল সামাজিক ঐক্যের আশায়। নিমাইপন্ডিত বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণত্বের নামে বিটলে বামুনদের এই নষ্টামি সহ্য করতে না পেরে, নিমাই পন্ডিত হুঙ্কার ছাড়লেন—একদিকে মুখে বলা হবে সকলেই এক অমৃতের পুত্র, পরম ব্রহ্মের সন্তান অথচ কার্যক্ষেত্র আচার বিচার ছোঁয়াছুঁয়ি ঘৃণা-

(এরপর ১২ পাতায়)

বিশ্বায়নের যুগে কিসের টানে শিক্ষিতা মহিলারা সন্ন্যাসিনী হচ্ছেন

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়

ইন্দিরা রায়

ভারতবর্ষ সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শের পীঠস্থান। এই ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, কর্মভূমিও বটে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন। সনাতনধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। শুধু আধ্যাত্মিকই নয়, দর্শন, শিক্ষা, জ্যোতিষ, শাস্ত্রপাঠ, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া—শান্তভাব প্রভৃতির সদগুণের প্রসার ঘটেছে—সেই হল আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ।

নবজাগরণের জোয়ারে ভারতবাসী নতুন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সারদা মা ও তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন, যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন—তা জীবনচর্যার প্রকৃত শক্তি ও মূলমন্ত্র। স্বামীজী বলেছেন,—ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। যে সকল জাতি মরিতে বসিতেছে, ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে, সর্বপ্রকার অসুবিধার প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে—সাবধান! ত্যাগের পথ, শক্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। প্রাচীনকালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনো এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনো ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে যে আন্দোলন, আলোড়ন এল সমাজে, তার মধ্য দিয়ে নারী জাগরণের উন্মেষ ঘটল। নারী উপলব্ধি করতে শিখল সেও মানুষ। মানুষ হিসেবে তারও নিজস্ব সত্ত্বা আছে, ব্যক্তিগত নীতি আদর্শ আছে। পরের দাসত্ব নয়। স্বনির্ভর বলিষ্ঠ একজন মানুষ হিসেবে তারও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকার আছে। এরপর থেকেই নারী তার আপন ভাগ্য জয় করতে এবং স্বাধিকার স্থাপন করতে সংগ্রাম শুরু করল। শিক্ষার যাবতীয় শাখায়, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এমনকী প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ক্রমে ক্রমে মেয়েরা নিজেদের জায়গা করে নিল। একবিংশ শতাব্দীতে লক্ষণীয়—পুরুষের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি সফল—মহাকাশে ভেসে বেড়াতেও তারা জয়যুক্ত।

যতদিন যাচ্ছে, মেয়েরা শুধু শিক্ষিত হয়ে ক্ষান্ত থাকছে না, স্বপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অসম্ভব রকমের 'কেরিয়ারিস্ট' হয়ে পড়ছে। ঘর সংসার করা নারীজাতির ধর্ম ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে চাইছে না। এর বাইরেও একটা জীবন আছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, এটা উপলব্ধি করেছে আধুনিক প্রজন্মের মেয়েরা।

কিন্তু এরই পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার অদম্য বাসনা ত্যাগ করে কোনও আধ্যাত্মিক সংগঠনে যোগদান করছেন সংসারের স্বাভাবিক ছন্দে পা না মিলিয়ে। একটা সময় ছিল, পুরুষের কাছে অবদমিত হয়ে সংসার করাই ছিল মেয়েদের একমাত্র কাজ। সংসারে তারা ছিলেন মায়াবদ্ধ জীব। পরিণত বয়সে যখন উপলব্ধি হত সংসারের যে প্রকৃত সত্য অর্থাৎ সংসার অসাড়—কিন্তু তখন নতুন করে জীবনের গতি ফেরানোর কোনও পথ ছিল না। এরই মধ্যে যারা পারিবারিক প্রভাবের ফলে আধ্যাত্মিক ভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তাদের কেউ কেউ আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ঠাকুর-মার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংসার ত্যাগ করতেন, কিন্তু আজকের বিশ্বায়নের যুগে যেখানে নানা প্রলোভন ছড়িয়ে আছে, নিজেকে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ বাড়ছে—সেক্ষেত্রে অল্পবয়সী শিক্ষিতা মহিলাদের এহেন প্রবণতায় সাধারণ মানুষের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন উঠেছে—কিসের টানে

তাঁরা জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে এ পথে পা রাখছেন! এ ব্যাপারে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সন্ন্যাসিনীদের এব্যাপারে মতামত।

এই বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা প্রবীণা সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা মাতাজি জানালেন ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে নিবেদিতা স্কুলে প্রথমদিকে ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা এবং সিস্টার কৃস্টিন।

সে সময়কার গোঁড়া হিন্দু সমাজে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে—এ চিন্তা ছিল অমূলক। তখনকার সমাজে বিশেষত উত্তর কলকাতার বনেদি শিক্ষিত পরিবারগুলিতে একটা আধ্যাত্মিক প্রভাব ছিল। এমনকী উক্ত পরিবার থেকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে এলেন ভগিনী সুধীরাদি। তাঁর দাদা ছিলেন দেবব্রত মহারাজ অর্থাৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। দাদার প্রভাবেই মা সারদামণির সান্নিধ্যে তিনি আসেন। তাঁর কাছে আসতে আসতে বোঝেন আধ্যাত্মিক পথটা কি। সুধীরাদির সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে গেল। তাঁরই সুযোগ্য ছাত্রী ছিলেন সরলাদি। পরবর্তী জীবনে যিনি হয়েছিলেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। সুধীরাদিই ভারতীদেবীকে সংসার ত্যাগ করিয়ে এ পথে নিয়ে আসেন। সরলাদি শুধু মা সারদার নয়, গোপাল মা, গোলাপমাকেও সেবা করেছেন। তাঁদের প্রয়াণের পর সারদানন্দ তাঁকে বেনারসে নিয়ে যান—১৯৫৪-য় সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট করে। ৭৩'-এ দেহ রাখেন। তিনি আধ্যাত্মিক প্রেরণার ভিত তৈরি করে দিয়ে যান। যার ওপর নির্ভর করে মেয়েরা আসবে। তিনি অনেককেই এ পথে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন—আত্মনো মোক্ষার্থং জগৎ হিতায়। কর্মেই জীবন। তাঁর বক্তব্যে চারটি যোগের উল্লেখ আছে—জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও ভক্তিযোগ। তিনি আরও জানালেন, বর্তমানে আমার কাছে অনেকে আসে, তারা উপলব্ধি করছে যে সংসার বাহ্যিক। উচ্চ আদর্শজীবন ধরে রাখা খুবই অসম্ভব। সেসব ক্ষেত্রে অনেক মেয়েই সঙ্ঘের আশ্রয় নেন। নারী যতই উন্নতি করুক, পুরুষ আজও তাকে দমিয়ে রাখতে চান। এ ক্ষেত্রে উভয় দিকেরই ব্যালেন্সটা ঠিক রাখতে হবে। আসল শান্তি পেতে গেলে আধ্যাত্মিক পথই শ্রেয়। বিশেষত ভারতীয় হিন্দুধর্মের আদর্শ মানেই তো মা-ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ স্পর্শ করে। এখনকার যেসব শিক্ষিকা বাড়ি থেকেই আসেন, তারা ভালোবাসা আর আধ্যাত্মিকতার টানে এখানে আসেন অর্থ প্রলোভন ত্যাগ করে।

বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারিণী অপর্ণাদেবীর কাছে জানা গেল সঙ্ঘে যোগদানের মূল উদ্দেশ্য। সায়েন্সে অনার্স গ্র্যাজুয়েট অপর্ণাদেবীর পনেরো-ষোল বছর থেকেই এই প্রবণতা ছিল। দাদু, দিদিমা, ছিলেন স্বামী বিরজানন্দের শিষ্য। কর্মযোগের মানসিকতা এই মহিলার। বিবেকানন্দের অনেক বই ওনাকে প্রভাবিত করেছে। সম্পূর্ণ ত্যাগী মনোভাব নিয়ে ২০০০-এ মিশন-এ যোগ দেন। প্রব্রাজিকা নির্বাণপ্রাণা ৯০-তে মিশনে যোগদান করেন। তিনি জানালেন—সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর মাত্র ইংরেজিতে স্পেশাল কোর্স করেন।

তিনি আরও বলেন, এটা আমার নিজস্ব অনুপ্রেরণায়। স্বামীজী যুক্তিবাদী ছিলেন। তাঁর রচনা আমাকে নাড়া দিয়েছিল। দু'নৌকায় পা দিলে হবে না। ভাবতাম, বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে সত্যটা জানা যাবে। কিন্তু স্বামীজীর রচনা পড়ে বুঝলাম তা হবে না। তখন সেই সত্যের সন্ধানে এ পথে আসি। এখন আমি অনেক শান্তি অনেক আনন্দ পাচ্ছি।

প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ নারীদের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটিয়েছেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—নারী শক্তিই প্রকৃত শক্তি। যে দেশে নারীদের সম্মান নেই, সেই দেশের উন্নতি নেই। প্রাচ্য নারী বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'সম্ভবত পৃথিবীর অন্যান্য নারীদের অপেক্ষা হিন্দু নারীগণ অধিকতর ধর্মশীলা ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন। আমরা যদি চরিত্রের এই সুন্দর গুণরাজি রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে
আমাদের নারীগণের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতের হিন্দুনারী জগতের আদর্শ নারী হইবে।'

শ্রীচৈতন্যের দান ও অবদান

(১১ পাতার পর)

অপমান করা চলবে না। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছে বলে কি পীর-পয়গম্বর নাকি! গীতার মহান বাণী মনে নেই—চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।

ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হয়েও যারা কুকাজ করে সমাজকে দাবিয়ে রেখে পাপ ও অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তারা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত, সম্মানিত হওয়ার যোগ্য?

চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণ— এই বজ্র ঘোষণা করে তিনি একাই রুখে দাঁড়ালেন, একেশ্বর ভগবানকে স্মরণ ও সম্বল করে। শান্তিপুরের কমলাক্ষ মিশ্র অদ্বৈত একেশ্বরবাদী অদ্বৈতাচার্য। তাঁর পূত আশীর্বাদ নিমাইকে অদম্য শক্তি দিল। তিনি হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে একেশ্বরের নাম গান শ্রীহরি সংকীর্তনে বেরিয়ে পড়লেন।

শাসক চাঁদ কাজী, হুসেন দবীর খাস শাহের দুই ক্ষমতা প্রদত্ত স্বরাষ্ট্র সচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং সাকর মল্লিক বা চীফ সেক্রেটারী (মুখ্যসচিব) পদে বৃত দুই ভাই বিখ্যাত পণ্ডিত সর্বজ্ঞ পরিবারের অমর সর্বজ্ঞ ও সন্তোষ সর্বজ্ঞ শান্তিরক্ষার জন্য হাজির থাকলেন। যে কোনও সমাবেশে বহাল হল নিষেধাজ্ঞা। নিমাই পরম কৃষ্ণ ভক্ত। শ্রীরামের মতো সত্য নিষ্ঠবীরও তাঁর দেবতা।

তাই তিনি সান্ধ্য আইন ভেঙে, মশাল জ্বালিয়ে গোটা নবদ্বীপের দীন দুঃখী সাধারণ মানুষকে,—যাদের উচ্চবর্ণের জাত বলে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না, তাদের সকলকে বুকে জড়িয়ে মহা স্লোগান দিলেন—হরে কৃষ্ণ, হরে রাম—"ওরে তোরা কৃষ্ণ হ' ওরে তোরা রাম হ" আর সেই পুণ্যময় দেবতা অবতারদের শরণ নিয়ে এগিয়ে চল বীরদর্পে। কেউ তোদের রুখতে পারবে না, কেউ তোদের বাধা দিতে পারবে না। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যা এতদিনের দলিত মথিত প্রাণ ঘুম ভেঙে ওঠা মানব সাধারণের প্রচন্ড স্রোতস্বিনী সত্যসন্ধ গতিবেগ রোধ করতে পারে।

সব কিছু উল্টে গেল, সমস্ত বাধা স্তব্ধ হয়ে গেল।

নবাবের পোষা দুরাচারী দুই নগর কেতোয়াল জগাই ও মাধাই কান্নায় ভেঙে পড়ল, নিমাই পণ্ডিতকে আঘাত করে। চাঁদকাজী ক্ষমা চেয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। দুই মহামন্ত্রী শরণ নিলেন। নিমাই পণ্ডিতের জাতপাতের বাঁধ ভাঙা নতুন মানবধর্মে—বৈষ্ণবধর্মের জন্ম হল। মালসাভোগের মাধ্যমে একত্র ভোজনে জাত পাতের জীর্ণ হয়ে আসা বাধা খড় কুটোর মতো দূরে ভেসে গেল। নিমাই নতুন মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। তাঁর এই বিপ্লব ধর্মবিপ্লব নয়, নির্জীব বেঁচে মরে থাকা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের পুনরুত্থানের আলিঙ্গন—বৈষ্ণব রেনেশাঁস যাকে বলা যায়।

কিন্তু নিমাই-এর উদ্‌ভ্রান্ত সৃষ্টিশীল মনে ঘুণধরা সমাজটাকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা এবং সেটা যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে। প্রথম সংসারের টান প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে ছিঁড়ে গেছে—এবার বিদ্যুৎ যাত্রা সুরু। বৈঠা হাতে করেই এসে পড়েছেন গৌরীদাসের তেঁতুল তলায়। বৈঠাটা গৌরীদাসের হাতে তুলে দিয়ে নিমাই বললেন—"এই নাও, এই বৈঠার সঙ্গে নামমন্ত্রও এবং ভাগ্যকে লঙ্ঘনের বাসনা ও সাধনা স্বরূপ পূর্ণ ভালবাসা দিয়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা, জীবকে যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করার অর্থাৎ বাঁচানোর জন্য। গৌরীদাস পরম আনন্দে বৈঠা গ্রহণ করলেন। আজও গৌর-গৌরীদাস মন্দিরে সেই বৈঠা রাখা আছে। যদিও মানুষ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, তুলসী চন্দনের অজ্ঞান ভাবাবেশে। ভুলে গেছে রাম ও কৃষ্ণের বিপ্লবী ও সত্যসন্ধি পদাঙ্ক অনুসরণের কথা। কয়েকদিনের কালনার অবস্থিতি ও একান্ত গোপনে গুহ্যলীলা-শলা-পরামর্শের পর, নিমাই গৌরীদাসকে নবদ্বীপে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁর হাতে তুলে দিলেন স্বহস্ত লিখিত গীতার প্রাঞ্জল ও ব্যাখ্যানিষ্ঠ অনুবাদের তাল পাতায় লেখা পুঁথি।

তখন নবদ্বীপে আরও প্রচুর পণ্ডিতের ভীড়। কিন্তু সকলেই ভয় পেতেন, নিমাই পণ্ডিতের লেখার জন্য তাঁদের লেখা আর কেউ পড়বে না।

শ্রীনিবাস আচার্য ইত্যাদির এই আশঙ্কায় নিমাই তাঁর সমস্ত স্বহস্ত লিখিত পুঁথিই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, কেবল বাকী ছিল 'গীতামৃত'। ওটা আর প্রাণে ধরে ফেলতে পারেননি। তাহলে যে কৃষ্ণপ্রেম লঙ্ঘন হবে। এবার পরিকর গৌরীদাসের হাতে সেটি তুলে দিয়ে নিমাই নিশ্চিন্ত হয়ে মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

তার পরের কাহিনী তো বিশ্ববিশ্রুত।

বিরোধীদের রক্তচক্ষু সত্ত্বেও ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিদ্যার্থী পরিষদের প্রার্থীরা জয়ী

প্রাণ প্রতিম পাল।। বিরোধী শিবিরের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। কয়েকটি কলেজে জিতেও গেল। বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীদের ওপর কোথাও কোথাও চলেছে হামলা, অপহরণ, মারধোরের মতো জঘন্য ঘটনা। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কালিনগর কলেজে বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্র সংসদ দখল করেছে। ওই কলেজের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হিসাবে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে পিন্টু মাহাতো এবং ভোলানাথ সানা।

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর শোভারাণী মেমো-রিয়াল কলেজে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় গুরুতরভাবে আহত বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মী পলাশ, পবন, সৌরভ, কৌশিকদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আন্দোলনকারী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মেদিনীপুর জেলার হিজলী কলেজে এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চারটি আসনে জয়লাভ করে এবিভিপি। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এস এফ আই যৌথভাবে হামলা চালায় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাদের ওপর। পরিষদের বেশ কয়েকজন কার্যকর্তাকে ভোটের আগে অপহরণ করা হয়। শুধু তাই নয়, গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাদের বাড়িতে-বাড়িতে বোমা ফেলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে বিরোধীরা। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পরিষদের বিভাগ সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডলের সঙ্গে পুলিশের ঝামেলা বাধে। তুফানগঞ্জ কলেজ নির্বাচনকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। কলেজ নির্বাচনের দিন প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। এ বি ভি পি-র কামাখ্যাগুড়ি শাখার সভাপতি মিঠু সরকার নির্বাচনের দিন উপস্থিত থেকে কার্যকর্তাদের উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, 'তুফানগঞ্জে বিদ্যার্থী পরিষদের কাজকর্ম বাড়তে থাকায় ভয় পেয়েই প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করল। বিদ্যার্থী পরিষদ এই কলেজ নির্বাচনে ২টি আসনে জয়লাভ করে। কলেজ নির্বাচনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের কোচবিহার নগর সম্পাদক উজ্জ্বল ধর, জেলা সংযোজক অংশুমান দে সরকার প্রমুখ। কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিদ্যার্থী পরিষদ জোট তৈরি করে জয়লাভ করেছে বলে পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে। এ পর্যন্তপ্রাপ্ত জয়ী প্রার্থীদের সংখ্যাসহ (বন্ধনীর মধ্যে) কলেজগুলোর নাম উল্লেখ করা হল।

১) হলদিবাড়ি কলেজ (৩)
২) বাগডোগরা কলেজ (৭)
৩) তুফানগঞ্জ কলেজ (২)
৪) ময়নাগুড়ি কলেজ (১)
৫) হেতমপুর কলেজ (১)
৬) খয়রাসোল কলেজ (১)
৭) বিদ্যাসাগর কলেজ (সিউড়ি)
৮) বিদ্যাসাগর কলেজ (দ: ২৪ পরগণা)
৯) কালিনগর কলেজ (১৫)
১০) গঙ্গাধর কলেজ (৪)
১১) সোনামুখী কলেজ (৩)
১২) খাতড়া কলেজ (১)
১৩) হিজলী কলেজ (৪)

মালদায় মাদ্রাসায় আবাসিক ছাত্রীরা যৌন নিগ্রহের শিকার

সংবাদদাতা ঃ মালদা।। শুধু সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর নয়, আরও অনেক অপরাধমূলক কাজের উৎসস্থল যে মাদ্রাসা তা প্রমাণিত হল মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার একটি মাদ্রাসাতে আবাসিক ছাত্রীদের ওপর যৌন নিগ্রহের ঘটনায়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার নরহাট্টা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাকুপুর গ্রামের জামিয়া ফতেমাতুজ মাদ্রাসার আবাসিক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মাহমুদা খাতুনকে 'কু প্রস্তাব' দেওয়ার অভিযোগে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ জানায় অভিভাবকরা। অভিযুক্ত চেয়ারম্যান মৌলানা নুরুল ইসলামকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করেনি।

ছাত্রীদের ওপর যৌন নিগ্রহের অভিযোগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আবাসিক ৫৪ জন ছাত্রীও তাদের বিরুদ্ধে ও বিভিন্ন সময়ে হওয়া যৌন নিগ্রহের জন্য পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে নিগৃহীত ছাত্রী মাহামুদা খাতুনও পুলিশ সুপারকে সব কিছু জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে মাহামুদা খাতুন পুলিশের কাছে ভয় মুখ খুলতে রাজি হয়নি। শোনা যাচ্ছে, অভিযুক্ত চেয়ারম্যান মৌলানা নুরুল ইসলাম মাদ্রাসার শিক্ষকদের এবং ছাত্রীদেরও বিভিন্ন হুমকি দিচ্ছে।

এদিকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি জেলা পুলিস সুপার-এর নিকট ৬ মার্চ তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই স্মারকলিপিতে অভিযুক্ত মৌলনা নুরুল ইসলাম ও তার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসহ ৬ দফা দাবি জানানো হয়েছে। বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষে উৎসব চক্রবর্তী (সম্পাদক), বিশ্বেশ্বর সিংহ, জগদীশ সরকার ও শ্যামল হেমব্রম স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন ও তার প্রতিলিপি সদর মহকুমা শাসক ও ইংরেজবাজার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়কে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের মুখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মৌলবীকে গ্রেপ্তার করে ভোট হারাতে কোনও রাজনৈতিক দলই রাজী নয়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি মুখে কুলুপ এঁটেছে। তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। আসলে ভোট বড় বালাই!

গুয়াহাটিতে যোগপীঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রামদেবজী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এবার অসমে গিয়ে যোগের মাধ্যমে জাত-পাত, উপাসনা ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধে উঠে সকল ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন যোগগুরু রামদেবজী মহারাজ। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রতিষ্ঠিত পতঞ্জলি যোগপীঠ-এর গুয়াহাটিতে নতুন কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তরুণ গগৈও উপস্থিত ছিলেন। রামদেবজী বলেন, যোগ হল ধ্যান এবং 'ওঁ'-এর ধ্যানই মানুষকে আধ্যাত্মিকতার গভীরতম জগতে নিয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এসময় দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদের দাপাদাপি, ফিদাইন বাহিনীর (আত্মঘাতী) হামলা নিত্য-প্রতিদিন ঘটে চলেছে। যোগের মাধ্যমেই এসকল বিপত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। অসমীয়ারা তাদের দৃঢ়তার জন্য বিখ্যাত। দেরিতে হলেও সেই আত্মপ্রত্যয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। অসমীয়া যুবকদেরকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনলে দেশ ও রাষ্ট্র উন্নত হবে। সমাজের ভিতর থেকে যোগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে দূর করতে হবে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই যোগপীঠ হচ্ছে প্রথম; দেশের মধ্যে দ্বিতীয়। রামদেবজীর প্রতিষ্ঠিত অন্য যোগপীঠ রয়েছে হরিদ্বারে। শ্রীগগৈ বলেন, যোগের মাধ্যমে সুস্থ সবল সমাজ নির্মাণ হয়। সবল সমাজ শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে। তিনি আশাবাদী যে,

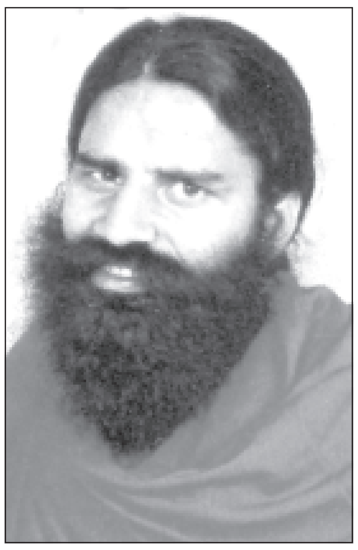

যোগপীঠের মাধ্যমে সন্ত্রাসকে ঠেকানোর সাহায্য পাওয়া যাবে। রাজ্য সরকার যোগপীঠকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে।

গুয়াহাটির শোনতলাতে এই যোগপীঠ নির্মিত হবে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ২১ লক্ষ টাকা এই কাজে প্রদান করেছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অনিল দাস পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এছাড়াও অন্য কয়েকজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সাধ্যমতো কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ বসন্ত কুমার ভুঞা এবং তাঁর ধর্মপত্নী মঞ্জু ভুঞা ৬ বিঘা জমি দিয়েছেন। সেখানে একটি যৌগিক হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। চিকিৎসা হবে নিঃশুল্ক।

সমাবেশ সমাচার

উত্তরবঙ্গে সূর্যনমস্কার প্রতিযোগিতা

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীগুরুজীর জন্মদিন উপলক্ষে উত্তরবঙ্গে জেলার প্রতিটি শাখায় সূর্যনমস্কার প্রতিযেগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ৪০০ শাখায় প্রায় ৮ হাজারের ওপর স্বয়ংসেবক এতে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় মালদার গৌড় খণ্ডের কাঞ্চনতার শাখায় সব থেকে বেশি সূর্যনমস্কার করে প্রথম হয়েছে। জেলার অনেক স্বয়ংসেবক ৮০০-রও ওপর সূর্যনমস্কার করেছে। প্রতিযোগিতার দিন উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘর প্রান্ত প্রচারক (উ.ব.) অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিভাগ কার্যবাহ ও জেলাপ্রচারক সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর মাসে জেলার ৩০০ শাখায় দণ্ডের প্রহার মার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। মালদার স্বয়ংসেবক দিলীপ সরকার ১২০৫১টি প্রহার মেরে সকলকে চমকে দেয়।

কামাক্ষ্যাগুড়িতে বিদ্যার্থী পরিষদের পথসভা

বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতিসহ একাধিক বিষয় নিয়ে অসমের কামাক্ষ্যাগুড়িতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি পথসভা অনুষ্ঠিত করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের স্থানীয় শাখা। পথ সভায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যার্থী পরিষদের বক্‌সিরহাট কলেজের ছাত্রনেতা উজ্জ্বল ধর, বিদ্যার্থী পরিষদের জলপাইগুড়ি বিভাগ সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পরিষদের রাজ্য সহ-সম্পাদিকা মিঠু সরকার, জলপাইগুড়ি বিভাগ প্রমুখ বিজয় পাল। ধন্যবাদ জানান কামাক্ষ্যাগুড়ি শাখার সম্পাদক বিপ্লব সরকার।

গৌজল

গোমূত্র থেকে নরম পানীয়। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সম্ভব। গোমূত্র থেকে যে নরম পানীয় তৈরি হবে, তা হবে দামে সস্তা। খেতেও দারুণ। কোলা ব্র্যান্ডের যত নরম পানীয় আছে, তাদের নাকি টেক্কা দেবে এই নতুন পানীয়। গো-হত্যা প্রতিরোধ বিভাগ 'গৌজল' নামের এই পানীয়কে চলতি বছরের শেষে বাজারে আনবে। হরিদ্বার থেকে গো-হত্যা প্রতিরোধ বিভাগের প্রধান ওমপ্রকাশ এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন। গৌজল শুধু গোমূত্রই থাকছে না, সেই সঙ্গে থাকছে ভেষজ উপাদান।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার সঙ্ঘচালক জগদীশ চন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র মনোজ ঘোষের (গোরা) বিবাহ উপলক্ষে গত ১ ফেব্রুয়ারি প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গপ্রান্তের প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ উদয় শঙ্কর সরকারের হাতে সমাজের সেবা কাজের জন্য নগদ ১০০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল, কোচবিহার বিভাগ সেবা প্রমুখ সাধন পালসহ অন্যান্য অধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

হাওড়া জেলার বাগনান (দুর্লভপুর গ্রাম) নিবাসী বর্ষীয়ান স্বয়ংসেবক ভীমাচরণ মিত্র (ভীমাদা) গত ২৮ ফেব্রুয়ারির ভোরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ৬ পুত্র এবং ২ কন্যা রেখে গেছেন। সুগায়ক এবং কীর্তনীয়া হিসাবে সঙ্ঘ মহলে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

★★★

স্বস্তিকার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার এজেন্ট বিধান মালাকারের মাতৃদেবী ছায়ারানী মালাকার গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি আজীবন সঙ্ঘপ্রেমী ছিলেন।

★★★

গত ২ ফেব্রুয়ারি মালদহ-র গৌড় রোড (বাসু শীতলা) এর প্রবীণ স্বয়ংসেবক এবং স্বস্তিকা ও অর্গানাইজারের পাঠক মিহির মজুমদার পরলোক গমন করেছেন। স্বস্তিকার প্রচার প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রীসহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু।

রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত উৎসবে সাংস্কৃতিক ঐক্যের সুর

রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত উৎসবের মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিরা।

মহীশূর থেকে ফিরে তিলক সেনগুপ্ত।। সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে 'রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত উৎসব' কর্ণাটকের মহীশূর শহরে গত ১৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল। প্রসিদ্ধ শ্রীগণপতি সচ্চিদানন্দ আশ্রম পরিসরে ওই সঙ্গীত মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। সভাগৃহে ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ৫ হাজার সঙ্গীতানুরাগীর

রঙ্গম

উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সঙ্গীত মহোৎসবের সূচনা করেন বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত সাধক পদ্মবিভূষণ ডঃ এম বালমুরলী কৃষ্ণনন। অনুষ্ঠানের মঞ্চে এদিন উপস্থিত ছিলেন শ্রীদত্ত বিজয়ানন্দ তীর্থ স্বামীজী, শ্রীগণপতি সচ্চিদানন্দ স্বামী, শ্রীশিবরাত্রি দেশীকেন্দ্র স্বামীজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত, সংস্কার ভারতীর সংরক্ষক যোগেন্দ্রজী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী পর্বে সংস্কার ভারতীর কর্ণাটক প্রান্তের শিল্পীদের সমবেত রাষ্ট্রবন্দনা ও ভাবসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ডঃ এম বালমুরলী কৃষ্ণনন বলেন, সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে কর্ণাটকী সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটানোর অভিনব প্রচেষ্টা। এই কাজে সারাজীবন আমার সহযোগিতা থাকবে।

আর এস এসের সরকার্যবাহ শ্রীভাগবত বলেন, সঙ্গীত ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। সঙ্গীত সাধনাই ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাই সংস্কার ভারতীকে এই বিষয়ে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

সৈফুদ্দিন ডাগরজী সহ বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীত সাধকদের সম্মানিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে কর্ণাটক প্রদেশে একটি সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সঙ্গীত মহোৎসবের দ্বিতীয় দিনের প্রভাতী অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংস্কার ভারতীর সঙ্গীতপ্রেমী শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গীত চর্চার ক্লাস নেন এম বালমুরলী কৃষ্ণনন। পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঘোষবাদন অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরকে অবলম্বন করে।

কর্ণাটকের শিল্পী এস রাজলক্ষ্মীর বীণা বাদন, পুণার শিল্পী পণ্ডিত উদয় ভালকার-এর হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, রাজস্থানের হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শিল্পী পণ্ডিত ডাঃ মধু ভাট ও ডাঃ আর এন শ্রীলথা-র কর্ণাটকী সঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পণ্ডিত শ্রীমতী কমলা বন্দে, কর্ণাটকী সঙ্গ ীতে সেরথেলে রঙ্গনাথ শর্মা ও বংশীবাদনে অংশ নেন ডাঃ এন রামানী।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতী সত্রে পণ্ডিত মঞ্জরী খারভী, ডাঃ আর কে শ্রীকান্থন, শ্রী দত্তশর্মা, এস সানকর, অসম প্রান্তের হিন্দুস্থানী শিল্পী পণ্ডিত ভবেশ কলিতা, ওড়িশা প্রান্তের শিল্পী পণ্ডিত দেবেন্দ্র শতপথী, মহারাষ্ট্রের শিল্পী পণ্ডিত সাধনা মোহিতী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় সত্রে সঙ্গীত সমারোহে আগত শিল্পী প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন কর্ণাটক সঙ্গীত নৃত্য একাডেমির চেয়ারম্যান পণ্ডিত নরসিমঞ্জলু ভদিভাতি। পরে কর্ণাটক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ও এস ত্যাগরাজন, কাশী প্রান্তের প্রখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত চিত্তরঞ্জন জ্যোতিষি।

রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত উৎসবে সমাপ্তি সমারোহে আশীর্বাণী প্রদান করেন পূজ্য গণপতি সচ্চিদানন্দ স্বামীজী।

স্বমহিমায় ফিরে আসুক পত্র-পত্রিকা

দীপেন ভাদুড়ী।। সম্প্রতি চারদিন ব্যাপী লিটল ম্যাগাজিনের শারদ সংখ্যার প্রদর্শনী ও উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে। আয়োজক সংস্থা 'লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি'। ১৯৮৩ সালে স্থাপিত এই সংস্থা ২০০৮ সালে রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করল। কয়েকজন কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় এই প্রতিবেদক জানতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে এই উৎসবের সুদৃঢ় হকিকৎ জানার জন্য তাঁরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এই প্রতিবেদককে 'লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি'র সম্পাদক নবকুমার শীল জানালেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা, বহির্বঙ্গ ও বহির্ভারত থেকে প্রকাশিত ছয় শতাধিক লিটল ম্যাগাজিনের শারদ সংখ্যা ১৪১৫ এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

পাঠকেরা সেইসব পত্রিকা হাতে নিয়ে, খুলে দেখলেন, পড়লেন, বিভোর হয়ে গেলেন ম্যাগাজিনের পাতায়। পত্রিকা চেখে ছড়াকার, গল্পকার, সঙ্গীতশিল্পী নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শেষদিনের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল অমোঘ। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের বৈঠকে তাঁরা তাঁদের 'বিচিত্র অভিজ্ঞতা' শোনালেন। পত্রিকা প্রকাশের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে তাঁরা বহু হীরে -মাণিক শ্রোতাদের ভিতর বিতরণ করেন। শ্রোতারাও অকুণ্ঠ চিত্তে সেগুলি গ্রহণ করলেন এবং উপভোগ করলেন। শ্রোতারা তাঁদের মনোভাব মুহূর্মুহূ করতালির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন।

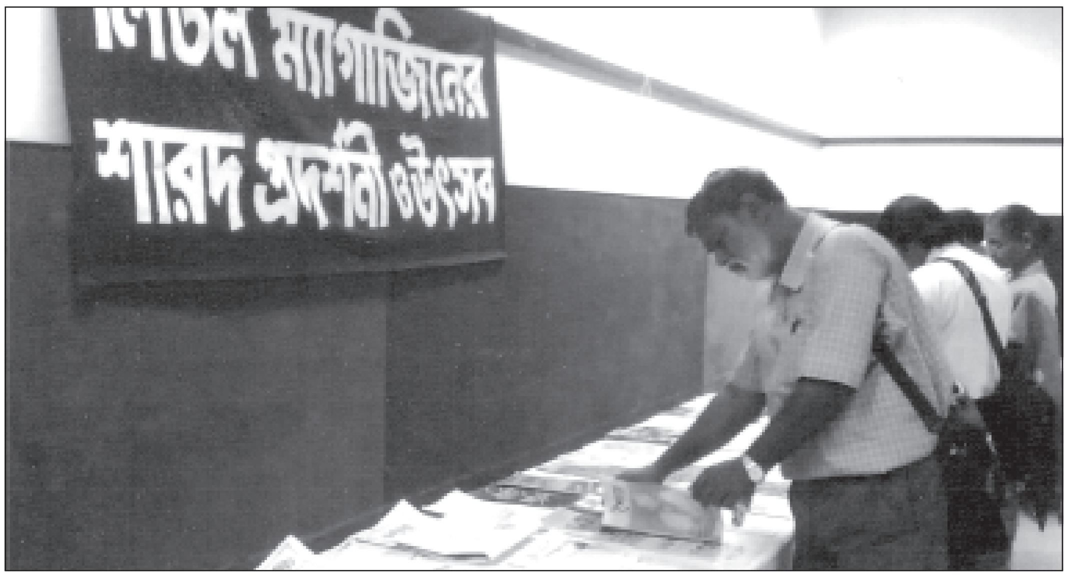

নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী।

বন্ধন। বৎসরান্তের এই উৎসবে যোগদানের জন্য তাঁরা আশায় আশায় থাকেন। এই উৎসব তাঁদের কাছে মিলন মেলা। অংশ গ্রহণ না করলে মনে হয় তাঁদের জীবন তরঙ্গ থেমে গেছে। তাঁরা কূপবদ্ধ জীবে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের নিজস্ব আড্ডা, কবিতা, ছড়া, গল্প পাঠ, সঙ্গীতের মাধ্যমে কয়েকটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় তাঁরা বুঝতেও পারেন না— এ এক অমোঘ আকর্ষণ। একে উপেক্ষা করা যায় না। মনের প্রসারতা বৃদ্ধি, মনোভাবের আদান প্রদান এবং লিটল ম্যাগাজিনের বর্তমান হাল দেখার এই সুযোগ সচরাচর পাঠকেরা পান না। সেজন্য তাঁরাও এই উৎসবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। সম্পাদক জানালেন, আরও অনেক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এখনও বহু পত্রিকা তাদের কাছে আসছে প্রদর্শন করার জন্য। এবং যেসব পত্রিকা এবছর অংশগ্রহণ করতে পারেনি সেসব পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ আগামী বছর তাঁদের পত্রিকা পাঠিয়ে এই প্রদর্শনীকে আরও সফল করার জন্য।

এই চারদিনে প্রায় তিনশতাধিক কবি, বেশ কয়েকজন লেখক জানালেন, এ ধরনের প্রদর্শনী আরও হোক। বাংলা পত্রিকার সঙ্গে পাঠকরা একাত্ম হয়ে যান এবং লিটল ম্যাগাজিন ক্রয় করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাক, তাহলেই বাঁচবে এসমস্ত পত্রিকা। বাঁচবে বাংলা সংস্কৃতির একটা বিরাট অংশ। বাঁচবে মুদ্রণ শিল্প, পত্রিকা পড়ার আগ্রহে কমে আসবে টিভি দেখার অমোঘ আকর্ষণ এবং বর্তমান প্রজন্ম উৎসাহিত বোধ করবে মুদ্রিত সাহিত্যে।

তপন সিংহ-র অসমাপ্ত ছবি শেষ করা নিয়ে চিন্তিত টালিগঞ্জ

সতীনাথ রায়।। তপন সিংহর অসমাপ্ত ছবি নিয়ে চিন্তিত টালিগঞ্জ। চিন্তা ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন নিয়ে নয়, চিন্তা ছবির যথার্থ চিত্রায়ন নিয়ে। তিনি বেঁচে থাকতেই ছবির অনেক কিছু ঠিক করে গিয়েছিলেন। ছবির নামও তিনিই ঠিক করেছিলেন। নাম রাখেন 'তিনমূর্তি'। শিল্পী নির্বাচনও হয়ে গিয়েছিল। ছবির জন্য বাছা হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র-র মতো নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। ছবির প্রযোজক রামঅবতার জালান। তিনি নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন ছবি প্রযোজনার কাজে। তপন সিংহ ছবির গান রেকর্ডিং ও ছবির দিনক্ষণ পাকা করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই টালিগঞ্জ থেকে বিদায় নেন তিনি।

এখন চিন্তা, উপযুক্ত পরিচালকের অনুসন্ধান। তাঁর মতো অনুভূতিপ্রবণ পরিচালক বাংলা সিনেমা জগতে অমিল। প্রযোজক রাম অবতার নিজেও এবিষয়ে চিন্তিত। 'দাদা সাহেব ফাল্‌কে' সম্মানে সম্মানিত তপন সিংহর ছবি শেষ করার মতো পরিচালকের বড়ই অভাব। অনেকে সাহসও পাচ্ছেন না। 'এক ডক্টর কি মউত', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'সবুজ দ্বীপের রাজা'-র মতো সিনেমা স্রষ্টার ছবি ফুটিয়ে তোলাও বড় কঠিন। সিনেমা সেভাবে না তৈরি হলে, সমালোচনার ঝড় বইবে। তবে প্রযোজক রাম অবতার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, তিনি ছবি শেষ করবেন। খুব শীঘ্রই আপামর দর্শক 'তিনমূর্তি' ছবি দেখতে পাবেন। ছবির কাহিনী নিয়ে এখনও কেউ মুখ খোলেননি। তবে চিন্তার ছাপ প্রযোজকের মুখে এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

লাল পিরীতি আস্তে, কখনও হাতে'তে চাঁদ, কখনও গলায় কাস্তে

বিশাখা বিশ্বাস

> “বাংলার জ্যোতি এবং কেরলের বিজয়নের সি পি আই এম নামক করাপসন্ পার্টি অব ইণ্ডি য়া (ম্যানুপুলেশন) এবার বাংলার বুদ্ধ আর কেরলের অচ্যুতানন্দনের হাতে পড়ে নাম বদ্‌লে হল কর্পোরেট পার্টি অব ইণ্ডি য়া (মানি)— মার্কসবাদ কেবল ‘সর্বশক্তিমানই’ নয়, তা পুঁজিবাদী বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানই এখন লাল নিশানের গায়ে লিখে চলেছে মৃত্যুস্বাদ, হিমতনু, বৈরি নখর আর টাটা-সালিম-জিন্দালের ইস্তাহার— ঈ-ই-ন-কি- লা-সা-ব !”

অতল রহস্যসিন্ধুর উথলে ওঠা ফেনপুঞ্জের মাথায় চেপে নির্বাচনের আগে আবার তিনি এসে গেছেন এবং তার আসার খবর শুনেই ইনি প্রাণের তারে তারে ঝংকার তুলে ঘোষণা করেছিলেন, ‘উনি আমাদের লোক’। ইনি ‘বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি’-র সর্বাপেক্ষা ‘দুঃসময়’-য়ের সর্বাধিক দুর্বিনীত এবং দুর্বৃত্ত নায়ক বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। সর্বোচ্চ ক্ষমতার সার্বিক অধঃপতিত নায়কের সেই ঘোষণার পর মাত্র দেড়খানি সপ্তাহ। দেড়খানা সপ্তাহ ফুরুবার আগেই ভারতের সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে মনোবীণার তারে তারে টান দিয়ে তিনিও চির চেনা সেই উদার-উদাত্ত কণ্ঠে কণ্ঠলগ্ন গানের ভাষায় আবার ঘোষণা করলেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে লেনিনস্য পুত্রাঃ, দিল্লীর শ্রীলক্ষ্মীর পদতলে চিরস্থির ও স্থায়ী ঠাঁই নেওয়া ঋদ্ধি র প্রতীক সেই সৌভাগ্যসূচক পক্ষীটি আবার বসেছে বংগ-রাজনীতির সর্বোচ্চ চূড়ায়। উনি তো কেবল আমাদের লোকই নন, ‘উনি জ্ঞানী, বিচক্ষণ, যোগ্যতাসম্পন্ন, আমি ওঁকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করি’।

তিনি সেকুলার বাংলার সেকুলারিজিমের ছত্রতলে আশ্রয়প্রার্থী বিশ্ববিশ্রুত সেকুলার লেখিকা তসলিমা বিতাড়নের সর্বাধিক শক্তিশালী নেপথ্যের নায়ক কমরেড সেলিম। কিন্তু, ব্যাপারটা কী? .... রহস্যটি কোথায়?

পুরনো চিঠির মতো সজল কৌতুকে আমাদের এখন আর সাহস নেই মার্ক্সীয় ইনকিলাবের দেখাতে মুখ। লেনিনেরা সবাই মরে গেছেন, বিশ্বাকাশ জোড়া সাম্রাজ্যবাদী মেঘসঞ্চ রণের ভেতর দুনিয়াব্যাপী মুমূর্ষু পুঁজিবাদের শেষ আলোর ঝল্‌কানির মধ্যে টাটা-সালিমদের চরণস্পর্শ করেও ঠেকানো যাচ্ছেনা মানুষের বিক্ষোভ, বামবাদী বৃত্তের বাইরে জ্বলতে থাকা বিদ্রোহের প্রকাশ্য অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে খোদ দলের অভ্যন্তরের গোপন ফস্‌ফরাস্-ও দিচ্ছে যোগ— ফুরোতে ফুরোতে নির্বাসনে যাবার শংকা বেড়েই চলেছে দিন দিন। উন্নয়ণের যান্ত্রিক ধারায় বেকারত্ব বিনাশের ছলনা বে-আব্রু হয়ে গেছে, পুঁজিপতির মন্ত্র কানে পুরে মাথায় শিল্পের বোঝা নিয়ে উন্নয়ণের সরোবরে সাঁতার কাটা নাটুকে নটবরের মিথ্যের সঙ্গে ঘরকন্নার ইতিহাস সিংগুর আর নন্দীগ্রামের মানুষের জীবনের শমীবৃক্ষে রেখে দেওয়া সত্যের গাণ্ডীব টংকারে ভেঙে ছত্রছন্ন হয়ে গেছে— সাহারার বুকে কল্পকাব্যের মরু-বাগিচার স্বপ্নপ্রেয়সীর হাত ধরে চলা সেই সব সপার্ষদ নটবরদের ঠিকানা এখন কেবল টাটা-জিন্দালের মনোবিতানে। আদিবাসী কুমারীর বুকের কৌমার্য টিপে টিপে ‘আমাদের গর্ব’ ফুটবল-খেলিয়ে সেই সব বেয়নেটধারীদের মাওবাদের তত্ত্ব খাড়া করার চক্রান্তকে মানুষেই ফাঁস করেছে। মার্কসবাদের ঘরে রোদ কুড়াতে গিয়ে হতাশ হল যেসব মার্কসবাদী, তাদেরই ললাটে সেঁটে দেওয়া হল মাওবাদী তকমা— শঠতার প্রাসাদে কপটতায় যারা গুছিয়ে নিয়েছে সংসারের আজীবন খোরাক, তারাই মার্কসবাদী এখন এবং মার্কসবাদই সর্বশক্তিমান। ‘এখানেই শেষ নয়, নিও গল্পের শেষটুকু লিখে’। বাংলার জ্যোতি এবং কেরলের বিজয়নের সি পি আই এম নামক করাপসন্ পার্টি অব ইণ্ডিয়া (ম্যানুপুলেশন) এবার বাংলার বুদ্ধ আর কেরলের অচ্যুতানন্দনের হাতে পড়ে নাম বদ্‌লে হল কর্পোরেট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (মানি)— মার্কসবাদ কেবল ‘সর্বশক্তিমানই’ নয়, তা পুঁজিবাদী বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানই এখন লাল নিশানের গায়ে লিখে চলেছে মৃত্যুস্বাদ, হিমতনু, বৈরি নখর আর টাটা-সালিম-জিন্দালের ইস্তাহার— ঈ-ই-ন-কি- লা-সা-ব !

অতএব, ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়, ব্যাপারটা হল, দাদা তোর পায়ে পড়ি/ পথ করে দে, আঁচল ধরি। কেননা, ইউ পি এ সরকারকে আরোহ পদ্ধ তিতে ব্ল্যাকমেল করতে করতে ক্ল্যাইম্যাক্সে উঠে অবরোহ পদ্ধ তিটা না জানার সেই যে সেই সরকারকে আমরা ফেলে দিতে বাধ্য হলাম, সেই থেকে আমরা চিরকালের পরজীবী কমিউনিস্টরা হলাম অনাথ প্রতিম অভিভাবকহীন— পক্ষান্তরে মলমূত্রের মতো লালবর্জ্য পদার্থগুলি দেহনিঃসৃত হবার পরই সনিয়া-সিংদের সরকারে পার্টিতে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ। লালদুর্গের ওয়ার কাউন্সিল দলের ভেতরেই অন্তর্ঘাতের ভয়ে ভীত, কম্যাণ্ড পোস্টে পাঠানো আলিমুদ্দিনের হুঁশিয়ারীকে এখন আর কেউ দেয় না মূল্য। পক্ষান্তরে নিপীড়নের ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলে বর্ধিত সংখ্যায় ঘাসফুলের বুকে পা রেখেছে হতভাগ্য নির্যাতিতের দল— কংগ্রেসের সাম্প্রতিকের মতিও এখন বোঝা দুরূহ ও দায়। অতএব ভয় পেয়েছে লালবিপ্লবীরা, দুর্বিনয়ের আস্ফালন বন্ধ করে এ কে গোপালনের কেরানী দিল্লীর সর্বোচ্চ কেতাবী নেতা থেকে বংগীয় ক্ষুদে হিটলার আর রিবেনট্রপেরা ত্রাসে শংকায় তার আসার আগেই তার জন্য তাই পেতে রেখেছে ফুলের নরম শয্যা। অস্যার্থঃ উনি আমাদের লোক.... আমি ওকে শ্রদ্ধা করি।....

তা বটে! সেই যে সেই ইন্দিরাজীর ঘরে গোলামগিরি করতে করতে ইন্দিরা-রাজনীতির ঘরানায় লালেদের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে উঠল, তারপর রাজ্যসভার সদস্যপদ প্রাপ্তি থেকে সাম্প্রতিকের নির্বাচনে জয়মাল্যের মূল্যে তারও বিবেকে জেগেছে সেই বোধ ঃ মোর নাম এই বলে পরিচিত হোক/ আমি তোমাদেরই লোক।....

অস্বাভাবিক নয়, ‘পুরনো সেই দিনের কথা সে কি ভোলা যায়!’ দীর্ঘ চারটি বছরের সেই নরম শয্যা, সেই সুখ-পরশ, কত সম্ভোগ, কত সেই সম্মান, সেই সুখ-স্মৃতি কী এত তাড়াতাড়ি হারায়! রহস্যটি তাই ঃ কংগ্রেস-সিপিএমের গোপন পিরীতি এখন যদিও সুদূর, ভোটের পরেই তা যেন আবার হয় মধুর। অশ্রু ঝরিয়ে যেখান থেকে তালাক-নামায় করেছি সই, নির্বাচনের পরেই ফুল ফুটিয়ে আবার যেন সেখানেই রই। তারই ইঙ্গিত ‘উনি আমাদের লোক’.... তাই আমরা ‘ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।’ শুভম্, শুভম্, সর্বম্ শুভম্।

বিদ্যুৎ বাঁচানোর লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ল্যাম্প বাজারে আনল সূর্য রোশনী

সূর্য রোশনীর কর্ণধার জয়প্রকাশজী (বাঁ দিকে) নতুন ত্বণ্ড্র ল্যাম্প উদ্বোধন করছেন।

দীপক গাঙ্গুলী।। আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তির সংরক্ষণের এক যুগান্তকারী গ্রীণ ইকো ফ্রেণ্ডলি ত্বণ্ড্র টেকনোলজি ল্যাম্প বাজারে ছাড়লো সূর্য রোশনী লিমিটেড। সম্প্রতি দিল্লীতে সংস্থার পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জয়প্রকাশ আগরওয়াল জানান, বৈদ্যুতিক বাল্ব তথা ল্যাম্প তৈরির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দুই বৃহৎ কোম্পানীর মধ্যে সূর্য রোশনী লিমিটেড অন্যতম। বর্তমান যুগে বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার যে ফারাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেদিকে নজর দিয়েই সূর্য রোশনী লিমিটেড অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই ল্যাম্প বাজারে ছাড়তে চলেছে। এই ল্যাম্পের ব্যবহারে শতকরা আশি শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বাঁচানো যাবে বলে তিনি দাবি করেন। এমনকী গ্রামাঞ্চ লের যেখানে ভোল্টে জ ওঠা-নামা করার জন্য ল্যাম্প বা বাল্বের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, এই ক্ষেত্রে তা থাকছে না। অর্থাৎ এই নতুন প্রযুক্তির ল্যাম্পে অটোমেটিক ভোল্টেজ স্টেবিলাইজিং পদ্ধ তিতে ভোল্টে জ ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রসঙ্গত, সূর্য রোশনী লিমিটেড প্রতি বছর ১৫ কোটি ল্যাম্প বিক্রি করে থাকে। স্বদেশের বাজারে সূর্য রোশনী লিমিটেড এক সুপরিচিত নাম। স্বদেশী এই কোম্পানি এই নতুন প্রযুক্তির ল্যাম্প দেশের তিরিশটি ব্রাঞ্চ থেকে এক লক্ষেরও বেশি খুচরো কাউন্টারের মাধ্যমে বিক্রি হবে।

যুবকদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হোসেনের ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মকবুল ফিদা হোসেনের আঁকা ছবি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোনও প্রভাব ফেলতে পারল না। তারই ফলস্বরূপ তা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হল হিমাচল সরকারকে। এতদিন পর্যন্ত এন সি ই আর টি অনুমোদিত একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের বিষয় হিসাবে তা রাখা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সেশনে তা বাতিল করা হচ্ছে। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিমাচল বোর্ড অফ স্কুল এডুকেশন। ফলে পরবর্তী সেশনে হোসেনের আঁকা ছবির পরিবর্তে রাখা হচ্ছে শোভা সিংহর ‘মিশাইল ম্যান’ নামে আঁকা ছবি। যেটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: আবদুল কালামের।

বোর্ডের চেয়ারম্যান সি এল গুপ্তা বলেন, আমরা সর্বসম্মত ভাবে মকবুল ফিদা হোসেনের ছবি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার থেকে সেখানে রাখা হচ্ছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: এ পি জে আব্দুল কালামকে। ডঃ কালাম এদেশের মানুষের সামনে রেখেছেন— ‘ভিসন ২০২০’। বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম রাষ্ট্র হবে ভারত।

Swastika
16 March - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

ধর্মান্তরিত বনবাসীরাই ৭০ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ১৯৪৭ সালে দেশে মোট বনবাসী জনসংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ ছিল ধর্মান্তরিত বনবাসী। আর আজ ৬০ বছরের মধ্যে এদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮ শতাংশ অর্থাৎ ঠিক দ্বিগুণ। এর পিছনে হাত রয়েছে বিদেশি মিশনারী চালিত চার্চগুলির। পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই ১৮ শতাংশ ধর্মান্তরিতরাই আজ হিন্দু বনবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ৭০ শতাংশ সুবিধা ভোগ করছে। অথচ শতাংশের বিচারে মোট বনবাসী জনসংখ্যার ৮২ শতাংশই হিন্দু।

সারা দেশে বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে এই ৮২ শতাংশ প্রকৃত বনবাসীরা মাত্র ৩০ শতাংশ ভাগ পাচ্ছে। কাজেই বরাদ্দের পুরোটাই ব্যয় হয় খৃস্টানদের জন্য। গ্রামীণ উন্নয়ণ বোর্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই যায় খৃস্টান বনবাসীদের উন্নয়ণে। মিজোরামে চাকমা ও রিয়াংদের মতো হিন্দু বনবাসীদের অবস্থাও খুবই খারাপ। বিতাড়িত।

মিজোরামে চাকমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়। চালু সাধারণ সুবিধাদির ক্ষেত্রেও তারা অমানবিক আচরণের শিকার। বাসে মিজোদের জন্য সিট ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়। সংরক্ষিত অরণ্য কিংবা চিড়িয়াখানা গড়ার নাম করে খৃস্টান পরিচালিত মিজোরাম সরকার তাদের জমি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিচ্ছে। রিয়াংদের অবস্থা আরও খারাপ।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক দশক আগে মিজোরামের চার্চ রিয়াং জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযানে নেমেছিল। তখন শত-শত রিয়াংকে খতম করা হয়েছিল, মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং যুবকদের আগেই হত্যা করা হয়েছিল। খৃস্টান ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচতে সেদিন রিয়াংরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং আজও তারা শরণার্থী শিবিরে রয়েছে। মিজোরাম সরকার, চার্চ এবং মিশন মদতপুষ্ট ছাত্র সংগঠন, পৌর প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সংগঠনগুলো প্রায়ই চাকমা ও রিয়াংদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে থাকে।

মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় চার্চের প্রাধান্য থাকায় এবং রাজ্য সরকারগুলোর ওপর তাদের প্রভাব থাকায় প্রকৃত বনবাসীদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার, জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় আর সেই জায়গাগুলো দখল করে এসব ধর্মান্তরিতরা।

শুধু মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো বিরাজ করছে ইমফলের অদূরে রংমাই নাগা অধ্যুষিত কাবুই গ্রাম। এখানে ধর্মান্তরিত খৃস্টান কেউ নেই। গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে খৃস্টান কিংবা ইসলামে ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই হিন্দু গ্রামই খৃস্টানদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই খৃস্টানরা ধর্মযাজকদের পাঠাতে থাকে। গোপনে তারা কাফুন কাসেই নামে একজনকে ধর্মান্তরিতও করে। এরই মাধ্যমে ওই গ্রামে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে মিশনারীরা। হিন্দু রংমইদের নিষেধাজ্ঞা না শুনে তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ভেঙ্গে সে বেশি বেশি করে মিশনারীদের আনতে শুরু করে। ফলে খৃস্টান গুন্ডাদের সঙ্গে স্থানীয় যুবকদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

খৃস্টানরা কারচুপির আশ্রয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি এবং খৃস্টান সংগঠনগুলোর কাছে মিথ্যা অভিযোগ জানায়। সংবাদ মাধ্যমগুলির মাধ্যমে একথা প্রচার করে যে এলাকার গীর্জা আক্রান্ত হয়েছে। অথচ এলাকায় কোনও গীর্জার অস্তিত্বই নেই।

অরুণাচল প্রদেশকেও নাগাল্যান্ডে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। অসমেও একই অবস্থা চলছে।

> ”
> **১৮ শতাংশ ধর্মান্তরিতরাই আজ হিন্দু বনবাসীদের জন্য সংরক্ষিত ৭০ শতাংশ সুবিধা ভোগ করছে। অথচ শতাংশের বিচারে মোট বনবাসী জনসংখ্যার ৮২ শতাংশই হিন্দু।**
> “

চলতি আইন অনুসারে একজন তপশিল জাতি যদি খৃস্টান কিংবা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ সে তপশিল থেকে বাদ যাবে। প্রশ্ন হল, এই আইন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কেন? কার্তিল ওরাঁও নামে একজন বনবাসী নেতা যিনি এক সময় সাংসদ ছিলেন, ১৯৭০-এর ১৭ জুন ২৩৫ জন লোকসভা ও ১৩ জন রাজ্যসভা সাংসদের স্বাক্ষর সমেত তিনি একটি স্মারকলিপি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে দিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী তখন কথা দিয়েছিলেন যে প্রকৃত বনবাসীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি সংসদে একটি বিল আনবেন। কিন্তু আদতে তিনি কিছু করেননি।

রাষ্ট্রপতিই একমাত্র পারেন ১৯৫০ সালের SC\ST আইন সংশোধন করতে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের পরামর্শমতো কাজ করতে বাধ্য। বনবাসীদের উচিত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এমন এক প্রধানমন্ত্রী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদ গঠন করা যাদের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি এই আইন সংশোধন করতে বাধ্য হবেন। আসন্ন নির্বাচন তাদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে।

ইতিমধ্যেই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মার্চ মাস জুড়ে সারা দেশে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে দিয়েছে।

এই স্বাক্ষর সমন্বিত একটি স্মারকলিপি তাঁরা জমা দেবেন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের হাতে।

বাঙালি মুসলিমরা আলিমুদ্দিনে পাত্তা পাচ্ছে না

(১ পাতারর পর)

এবার সেই সমর্থনের ভোট ব্যাঙ্কে ধস নেমেছে। তপশীল ও মুসলিম প্রধান তিনটি বিধাসভা কেন্দ্র সুজাপুর, নন্দীগ্রাম ও বিষ্ণুপুর আসনের উপনির্বাচন সেই ধসের সাক্ষী। বিপদ বুঝে তাই বামপন্থীরা প্রচার শুরু করেছে যে তারা নির্বাচনে জিতলে মুসলিমদের ‘‘অনগ্রসর সম্প্রদায়’’ হিসাবে চিহ্নিত করে শিক্ষা চাকরি ইত্যাদিতে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেবে। এই পাইয়ে দেওয়ার বামপন্থী রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মন কতটা ভেজাবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে গত ৩০-৩২ বছরে বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য কিছুই করেনি। শুধু নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। গুজরাতে মুসলিমদের সার্বিক উন্নয়ণের জন্য মোদী সরকার যা করেছে তার ১০ শতাংশও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গত তিন দশকে করেনি। টিভি ও সংবাদপত্রের দৌলতে এই তথ্য এখন আর অজানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমরা জানেন যে সি পি এম দলের চোখে মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্থ একমাত্র উর্দুভাষী মুসলিমরা। যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন হালিম, সেলিম ও আমিনরা। গ্রামে বসবাসকারী বাঙালি দরিদ্র মুসলিমরা আলিমুদ্দিনে পাত্তা পায় না। এই হালিম-সেলিম-আমিনদের মুসলিমরাই রাজ্যের সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির মালিক। রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি সর্বক্ষেত্রেই এই উর্দুভাষী মুসলিমদেরই একাধিপত্য। এদের দেখিয়েই গত তিন দশক ধরে বামফ্রন্ট সরকার দাবি করে এসেছে যে তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছুই করেছে। দেরিতে হলেও বাঙালি মুসলমানরা এই মিথ্যাচার বুঝেছেন। এরই প্রতিফলন ঘটেছে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের এবং সম্প্রতি হয়ে যাওয়া বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফলে। গ্রামের বাঙালি মুসলিমরা জানিয়ে দিয়েছেন শহরে উর্দুভাষী নেতা হালিম-সেলিম-আমিনরা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। বাঙালি মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা মাদ্রাসা শিক্ষায় মোটেই আগ্রহী

মহম্মদ আমিন

আবদুল হালিম

নয়। তারা মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশুনা করতে চায়, শিক্ষার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র ধর্মীয় মাদ্রাসা শিক্ষায় যে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না সে কথা বাঙালি মুসলমান জানেন। তাই গ্রামে-গ্রামে মাদ্রাসা খুলে দিয়ে অথবা কলকাতায় মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিতে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানদের মন পেতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

একটা কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আশাকরি বুঝেছেন যে, তিন দশকের একচেটিয়া ক্ষমতায় বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে পার্টির অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিরাই ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পার্টির সমর্থন না হলে এই রাজ্যে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না। বামফ্রন্ট সরকারের নীতিই হচ্ছে যে বাম বিরোধীদের গণশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা। এর প্রমাণ, বাম বিরোধী সংবাদপত্রকে সরকারি বিজ্ঞাপন না দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় সমস্ত নিরপেক্ষ পত্র-পত্রিকাতে রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দেয় না। এটাই বুদ্ধদেববাবুদের নীতি। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্রাম বাংলার ছোট-ছোট সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্র-পত্রিকা। তারা বিজ্ঞাপন তো দূরের কথা সামান্য সরকারি স্বীকৃতি-টুকুও পায় না। অথচ অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত সি পি এমের তল্পিবাহক পত্র-পত্রিকা নিয়মিতভাবে সরকারি অনুগ্রহ পায়। ভাবতে অবাক লাগে যে এত বছর ধরে চলা এমন সরকারি বৈষম্যের পরেও গ্রাম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ পত্রপত্রিকাকে পার্টির তল্পিবাহন করা যায়নি। বুদ্ধদেববাবুর তথ্য দফতরের বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ অর্থের ৯০ শতাংশ পায় কলকাতার তিন-চারটি দৈনিক। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সকলেই এই তথ্য জানেন। অথচ রাজ্যের সাংবাদিক সংগঠনগুলি এক জোট হয়ে কোনওদিনই সেভাবে প্রতিবাদ করেনি। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে বুদ্ধিজীবীদের মঞ্চ গড়ে উঠেছে সেখানেও এই বিষয়টি নিয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি। বুদ্ধদেববাবুকে কেউ বলেননি যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, পার্টির মুখ্যমন্ত্রী নন। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে তিনি বাম সমর্থক ও বাম বিরোধীদের সমান দৃষ্টিতেই দেখবেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের এটাই স্বীকৃত নীতি। সি পি এম এই নীতি মানে না। তাই এই দল ভারতীয় গণতন্ত্রের শত্রু।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com